মুসলিম মনন অধ্যয়ন

হাসান হাথুত

ভূমিকা আহমদ জ়াকি য়ামানি

মুসলিম মনন অধ্যয়ন

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রচ্ছদ : প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন লেখক, যা ইলেকট্রোএনসেফ্যালোগ্রাফিক ট্রেসিঙের সূচক, বইয়ের নামের দ্যোতক।

মুসলিম মনন অধ্যয়ন

হাসান হাথুত

ভূমিকা আহমদ জ়াকি য়ামানি

AP

আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন

আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কপিরাইট মার্চ 1995 আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত

পুনর্মুদ্রণ 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003 ও 2005

পাবিলকেশন ডেটার ক্যাটালগ করেছে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

হাথুত, হাসান।

মুসলিম মনন অধ্যয়ন, হাসান হাথুত : ভূমিকা লিখেছেন আহমেদ জ়াকি য়ামানি।

p. cm.

বিবলিওগ্রাফিক্যাল রেফারেন্স ও সূচি অন্তর্ভুক্ত

আইএসবিএন 0-89259-156-0 – আইএসবিএন 0-98259-157-9 [pbk.]

1. ইসলাম 1. নাম

BP161.2H84 1994

297–dc20 94-46150

CIP

প্রচ্ছদ : প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন লেখক, যা ইলেকট্রোএনসেফ্যালোগ্রাফিক ট্রেসিঙের সূচক, বইয়ের নামের দ্যোতক।

তাঁদের কাছে যাঁরা ভালোবাসা, সত্য ও মানব পরিবারের কাছে দায়বদ্ধ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটি লেখার জন্য আমাকে সক্ষমতা দিয়েছেন বলে আল্লাহকে ধন্যবাদ। এমনকি দীর্ঘকাল অসুখে আক্রান্ত হয়ে আমি অবরুদ্ধ ছিলাম, এ ছাড়া আমি সম্ভবত এমন এক ভবিষ্যতের জন্য গড়িমসি করতাম যা হয়তো কখনো আসত না, 'খুব ব্যস্ত' বিভ্রান্তির অধীনে থাকতাম। যেমন কোরাল বলে : 'তুমি হয়তো একটি বিষয় অপছন্দ করতে পারো, এবং আল্লাহ এটা আনেন দুর্দান্ত সুন্দরের মধ্য দিয়ে' (4 : 19)।

প্রফেট মহম্মদ বলেছেন, 'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, আল্লাহর প্রতিও নয়।' সেজন্য আমি আমার স্ত্রীর তুমুল সমর্থন, সাহায্য ও অবদান সর্বান্তকরণে স্বীকার করছি। সালোনাজ, আমাকে খুব বিস্মিত করেছে। তিপ্পান্ন বছর আগে আমাদের বিয়ের পর থেকে এটাই প্যাটার্ন।

আমার ভাই ও বন্ধুদেরও ধন্যবাদ যারা আমাকে অনবরত লেখার জন্য প্রেরণা দিয়েছে, সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছে যে বহু সপ্রতিভ ভাষণের চেয়ে একটি বই অনেক বেশি স্থিতিশীল, যে পরামর্শ ছিল খুবই আবশ্যক।

আমি বিশেষ করে কৃতজ্ঞ আমার প্রিয় বন্ধু ও মহান আত্মা শ্রীমতী ক্যারল ডি মার্সের প্রতি, তিনি স্বেচ্ছায় আমার লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পুনরীক্ষণ করেছেন ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আমার প্রকাশের প্রতি আমি সবসময় কৃতজ্ঞ, তাঁরা আমার কাজ সহজ ও মধুর করে তুলেছেন।

অবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহযোগী শ্রীমতী হেদাব আল-তারফিকে, তিনি পাণ্ডুলিপি দ্রুত টাইপ করেছেন, কখনো পরিমার্জন বা পরিবর্তনের কথা বলেননি। আল্লাহকে সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

হাসান হাথুত

সূচিপত্র

ভূমিকা : আহমদ জ়াকি য়ামানি

আত্মকথন

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর?

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাহলে কী?

ইসলামের ধর্মবিশ্বাস

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও অন্যরা

দ্য পিওপল অব দ্য বুক

মতবাদের ব্যবধান

ইহুদি

খ্রিস্টান

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের অবয়ব

শরিয়তের একটি সাধারণ রূপরেখা

শরিয়তের উৎস

শরিয়তের লক্ষ্য

চার্চ ও দেশ

গণতন্ত্র

অন্তরাত্মা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

ইসলামে মৃত্যুহার

কোরানের একটি স্পর্শ

পয়গম্বর বলেছেন

পঞ্চম অধ্যায়

জ্বলন্ত সমস্যা

নতুন পৃথিবীর নিয়ম

জেহাদ

পরিবার ও যৌন বিবর্তন

জৈব চিকিৎসা নীতি

প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়

অঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপন

মৃত্যুর সংজ্ঞা

ইউথেনেজ়িয়া

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

উপসংহার

শব্দকোষ

নির্ঘণ্ট

সূচিপত্র

ভূমিকা

শেখ আহমদ জ়াকি য়ামানি*

ভূমিকা

শেখ আহমদ জ়াকি য়ামানি*

বিশ্বের প্রধান-প্রধান ধর্মের মধ্যে, ইসলাম ধর্মের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে তার নামের দিক দিয়ে। এই ধর্মের নাম কোনও জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির নামে হয়নি। যেমন ইহুদি ধর্মের নামকরণ হয়েছে ইয়াহুদার নাম অনুসারে, খ্রিস্টান ধর্মের নাম হয়েছে যিশু খ্রিস্টের নাম অনুসারে, এবং বৌদ্ধ ধর্মের নাম হয়েছে বুদ্ধদেবের নাম অনুসারে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের নাম পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নাম অনুসারে হয়নি। আল্লা তাঁকে শান্তি দিন, তাঁকে দোয়া করুন। অতীতে বহু প্রাচ্যবিদ মুসলমানদের 'মহম্মদীয়' বা 'মহমেডান' বলে অভিহিত করতেন। তা সত্ত্বেও, মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মের এইসব নামকে গ্রহণ করেনি।

ইসলাম শব্দের উৎপত্তি এই দু'টি শব্দ থেকে: তসলিম, অর্থাৎ সমর্পণ, এবং সলাম, অর্থাৎ শান্তি। এই ধর্মের সার কথা হল, এক পরিপূর্ণ ও সুসংহত আদর্শ। যা মানবের সঙ্গে তার স্রষ্টার সম্পর্ককে এবং তার পাশাপাশি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিচালিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লার সঙ্গে মানবজাতির যা সম্পর্ক, তা হল স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতি তাঁর সৃষ্ট জীবের সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। এটাই হল ইসলাম শব্দের অপরিহার্য ও সাধারণ অর্থ। পয়গম্বর মহম্মদের মাধ্যমে প্রকাশমান হওয়া ধর্মের মধ্যেই ইসলাম শব্দের অর্থ সীমিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের পয়গম্বর মহম্মদের আগে যেসব পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের অনেককেই (আল্লা তাঁদের শান্তি দিন) কোরানে মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, কোরান আমাদের বলে যে, আব্রাহাম এবং বলতে গেলে সমস্ত পয়গম্বরের ধর্মই ছিল ইসলাম। কোরানে বলা হয়েছে:

... তোমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামের ধর্ম। এই গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থের আগে, তিনিই (আল্লা) তোমাদের মুসলিম নাম প্রদান করেছেন। আল্লার মুখ-নিঃসৃত কোরান সে-কথারই সাক্ষ্য বহন করছে তোমাদের সামনে, এবং তোমরাও হয়তো তার সাক্ষ্য বহন করবে সমগ্র মানবজাতির সামনে।

অন্যদিকে, মানবজাতির মধ্যে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিচালনা করে ইসলাম শব্দের দ্বিতীয় মূল শব্দ শান্তি। এই শব্দেরই অন্তর্গত আরও দু'টি শব্দ হল সহিষ্ণুতা ও দয়া। মুসলমান সম্পর্কে আমাদের পয়গম্বরের সংজ্ঞা হল, "মুসলিম হল সে-ই যার কথা শুনে এবং সহায়তা পেয়ে মুসলমানরা সুরক্ষা বোধ করে।" পয়গম্বর প্রায়ই সহিষ্ণুতার কথা বলতেন এবং সহিষ্ণুদের গুণগান করতেন। তিনি বলতেন, "যারা কিছু দেওয়ার ব্যাপারে এবং কিছু নেওয়ার ব্যাপারে সহিষ্ণু, তাদের আল্লা সর্বদা দয়া করেন।"

সেনাবাহিনীতে আজকাল রুলস অব এনগেজমেন্ট বলে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ, দক্ষ কোনও সেনাবাহিনী, কখন-কেন-কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেই শব্দ ধার করেই বলা যেতে পারে, যুদ্ধনীতিতে একজন মুসলমান কেবল তখন-ই কোনও অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যখন কোনও অ-মুসলিমের থেকে মুসলমানের কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। শুধুমাত্র এরই ভিত্তিতে একজন মুসলমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে বলে আল্লার সম্মতি আছে। কোরানে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

যাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, কেবল তাদেরকেই (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং আল্লা অবশ্যই তাদের জয়ী করবেন।

অ-মুসলমান, বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আহলে কিতাব-এর মানুষদের সঙ্গে মুসলমানদের যে-সম্পর্ক, তা এমন এক বিষয়, যার অজস্র দিক রয়েছে। এটা নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। এই ভূমিকায় অত কথা, বলে বোঝানো যাবে না। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, এই সম্পর্কের ভিত হল দু'টো আদর্শ- সহিষ্ণুতা ও শান্তি। এই দুয়ের কথাই কোরানে বলা হয়েছে, এবং পয়গম্বরও এই দুয়ের কথাই বলতেন। কিন্তু, বহু মুসলমানই এই দুই আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু বারই ঘটেছে। অবশ্য যারা আদর্শচ্যুত হয়েছে, তারা মুসলমান হতে পারে, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ঠিক যেমন বহু খ্রিস্টানের মধ্যেও অ-খ্রিস্টীয় আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, ব্যক্তি হিসাবে তারা খ্রিস্টান হলেও, যিশু খ্রিস্টের (আল্লা তাঁর মঙ্গল করুন) বাণীর সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

ইসলামের আরেক স্বাতন্ত্র্য এই যে, একজন মুসলিমকে অতি অবশ্যই অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে; এমনকী তাঁকে নিজের সঙ্গেও শান্তিতে থাকতে হবে। তবেই একজন মুসলমান আল্লার ইচ্ছার প্রতি নিজেকে পরিপূর্ণ নিবেদন করতে পারবে। ইসলাম এজন্যই অনন্য যে, এই ধর্ম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনকে পরস্পরের উপযোগী করে তোলে এবং এই দুয়ের মধ্যে এক সমন্বয় সৃষ্টি করে। ব্যবসায়িক লেনদেন ও ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে যেসব নিয়মের কথা ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে, সেসব যাঁরা জানেন, তাঁরাই এ কথা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, একজন মুসলমান তার ধর্মের মাধ্যমে যে-আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে, তাকেই অনুসরণ করে সে তার জাগতিক জীবনকে যাপন করে। অন্যদিকে, ইসলামে ইবাদাহ হল দোয়া ও সালাত-এর মিশ্রণ। এর উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিকতার মূল কথা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। মুসলমানদের দৈনন্দিন নমাজে রয়েছে সাতটি সালাত বা অঙ্গ সঞ্চালন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল রোকু (সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া)। এই ভাবে মুসলমান তার আল্লার মহত্ত্বের সামনে নিজের বিনম্রতা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় থেকে সে বলে, "আল্লাহু আকবর" (আল্লা! তুমি মহান।)। আরেকটি সালাতের নাম সুজুদ। অর্থাৎ, প্রার্থনা করার সময় বসে উপুড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকানো। এই ভাবে প্রার্থনা করে বোঝানো হয় যে, আল্লার অপার মহিমার সামনে মানুষের অস্তিত্ব খুবই তুচ্ছ। এই ভাবে থেকে আল্লার সেবক বারে-বারে বলতে থাকে, "সুভানা রব্বিয়াল অ'লা" (আল্লা তুমি আছ সবার উপরে, তুমি মহান)। এইসব অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একজন মুসলমান এটাই বোঝায় যে, সে তার আল্লা তথা স্রষ্টার সেবা করতে ইচ্ছুক, সে আল্লার কৃপা ও করুণার প্রতি নিজের বিশ্বাস ও আস্থাকে ন্যস্ত করে। সামনের দিকে ঝুঁকে এবং উপুড় হয়ে একজন মুসলমান নিজের পরম বিনম্র ভাবকে প্রকাশ করে। এই বিনম্রতা শুধু তার আল্লার প্রতি, আর কারও প্রতি নয়। কোরান এই কথাটা মুসলমানদের বলতে শেখায়:

একমাত্র তোমাকেই আমরা ইবাদাহ করি, কিছু চাওয়ার থাকলে, একমাত্র তোমার সামনেই হাত পাতি।

অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে মুসলমানের ধর্ম মুসলমানকে বলে যে, সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে।

মানবজাতির ইতিহাস বেশ কয়েকটি সভ্যতার সাক্ষী থেকেছে। যেমন: চিনা সভ্যতা, ফ্যারাও সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা ও রোম সভ্যতা। সাক্ষী থেকেছে ভারতীয় সভ্যতারও। ইসলামের পূর্বে গড়ে ওঠা প্রত্যেক সভ্যতাই কোনো না-কোনো দিক দিয়ে একে অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন গ্রিক সভ্যতায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল দর্শন। রোমান সভ্যতা নিজেকে

পোক্ত করেছিল স্থাপত্যের মাধ্যমে। অন্যদিকে, ইসলামি সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের প্রধান-প্রধান সমস্ত ক্ষেত্রেরই উন্নতি হয়েছিল এই সভ্যতায়। যেমন: চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ বিদ্যা, গণিত, দর্শন এবং সেই সঙ্গে স্থাপত্য। কিন্তু ইসলামি সভ্যতা তার পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের জোরে। সেটা হল এই যে, ইতিহাসে ইসলামের জন্মের একেবারে নিখুঁত সময়টা আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ, যে সময় আমাদের পয়গম্বরের সামনে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস প্রকট হয়েছিল। সময়টা ছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক। এর বিপরীতে অন্যান্য সভ্যতার শ'-শ' বছর লেগেছিল বিকাশ লাভ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। সেইসব সভ্যতার উৎপত্তি ঠিক কবে, বা আমরা যাকে বলি জন্মের সাল-তারিখ, তা তাদের জানা নেই। তাছাড়া, এটাও জানা যায় না যে, যে-রকম সামাজিক পরিবেশে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই পরিবেশে দাঁড়িয়েই তারা ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল কি না। ইসলামি সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞান-বিজ্ঞান। সপ্তম শতকের মক্কার আরবেদর পক্ষে এই ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না; কেননা তারা ছিল আসলে অজ্ঞ ও নিরক্ষর। পয়গম্বর মহম্মদের (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন, তাঁকে দোয়া করুন) আহ্বানেই আরবদের ভিত নড়ে গিয়েছিল, তাঁদের সামাজিক গঠনটাই পুরো উলটে গিয়েছিল। পয়গম্বরের আহ্বানে এবং আল্লাহর বাণী শোনার পর তাদের মধ্যে বদল এসেছিল। এরপর তারা, সেই সময়কার পরিচিত জগতের সমস্ত ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করল, এবং তারা এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসের গতিপথকেও বদলে দিয়েছিল।

এ কথা সত্য যে, ইসলামের আগে আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব প্রথা প্রচলিত ছিল, সেগুলোকে কোরান ও পয়গম্বরের সুন্নাহ* সম্পূর্ণ বিলোপ করল না। কোনো-কোনো প্রথাকে চলতে দেওয়ার পক্ষে কথা বলা হল, কোন-কোনো প্রথাকে সামান্য বদলে নিয়ে নতুন নিয়ম-নীতির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে খাপ খায় না, এমন প্রথাগুলোকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হল। যেসব প্রথাকে কোরান বা সুন্নাহ সরাসরি নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি, সেগুলোকে নিয়ে পরবর্তী কালে বেশ কয়েক জন আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা করেছিলেন। তাঁরাই মূল সন্দর্ভগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই সময় যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সে সবের মাধ্যমেই কয়েকটি প্রাচীন ও অপ্রত্যাশিত বেদুইন প্রথার লক্ষণ শরিয়ত (ইসলামি আইন)-এ জায়গা করে নিয়েছিল। শরিয়তের এই অংশগুলো, যা আমরা পরে দেখব, অপরিবর্তনীয় নয়; এবং এগুলোকে নিয়ে প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত আইনজ্ঞদের দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। সেটা অবশ্য খুবই দীর্ঘ একটা বিষয়, এবং সেটাকে নিয়ে গভীরে গিয়ে চর্চা করতে হবে। যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

যাই হোক না-কেন, পরিবার আইনের ক্ষেত্র থেকে দু-একটা উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বহুগামিতা এবং নিজের স্ত্রীকে ইচ্ছে মতো তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের অধিকারকে ব্যাপক ভাবে মেনে নেওয়ার প্রচলন ছিল প্রাক্-ইসলাম আরবে। একজন পুরুষ নিজের ইচ্ছে মতো একাধিক মহিলাকে বিয়ে করতে পারত; অবাধে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং একজনকে বদলে আরেকজনকে স্ত্রী করতে পারত। এসব ব্যাপার পয়গম্বরের (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন, তাঁকে দোয়া করুন) জীবনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একজন পুরুষ একসঙ্গে কতজনকে নিজের স্ত্রী করে রাখতে পারবে, ইসলাম সে ব্যাপারে একটা সীমা বেঁধে দিয়েছিল। একাধিক বিবাহের অধিকারও ইসলাম এই মর্মে দিয়েছিল যে, একজন পুরুষ তা করতে পারবে তবেই, যদি সে তার সব স্ত্রীর প্রতিই সমান ভাবে সুবিচার করতে পারে। এইসব বিধি-নিষেধ মেনে একাধিক বিবাহ করার অধিকারে আইনের সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল বিশেষ এক পরিস্থিতির কথা বিচার করে। যেসব পুরুষ অনাথ শিশুর লালন-পালন করতেন, তাঁদের জন্যই ছিল এই অনুমোদন। অনাথ শিশুদের নামে থাকা সম্পত্তিকে যদি কেউ নিজের নামে করতে চায়, তাহলে তাদের পরিণতি খুব খারাপ হবে বলে কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

সাবধান, যারা অন্যায় ভাবে অনাথদের সম্পত্তি গিলে খায়, তাদের পেটের ভিতর শুধু আগুন জ্বলবে (পরবর্তী জীবনে) তাকে সেই আগুনের জ্বালায় পুড়তে হবে। (4:10)

অনাথ শিশুদের সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব যেসব মুসলমানদের দেওয়া হত, তাদের এই বলে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তারা যেন এই সম্পত্তি পয়গম্বরের হাতে ফিরিয়ে দেয়, এরকম না-করা হলে আল্লাহর নিয়মকে লঙ্ঘন করা হবে। অনাথদের সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব পেয়ে, কেউ হয়তো সেগুলো নিজের নামে করে যেখানে-সেখানে খাটিয়ে নিজের সম্পত্তির পরিমাণ বাড়াতে পারে; তারপর হয়তো সে আর অনাথের সম্পত্তি অনাথকে আর ফেরতই দিল না। এই আশঙ্কা থেকেই অনাথদের সম্পত্তির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কোরানের আরও একটি বাণী প্রকট হয়েছিল। যেমন:

তোমার যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, তোমার দায়িত্ব থাকা সব অনাথ শিশুদের প্রতি তুমি সমান আচরণ করতে পারবে না, তাহলে এমন দুই, তিন বা চারজন মহিলাকে তুমি বিবাহ করতে পারো, যারা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। কিন্তু যদি তোমার এই আশঙ্কা থাকে যে, তুমি তোমার সব স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে না, তাহলে (মাত্র) একজনকেই বিবাহ কোরো। ...(4.3)

এটা খুবই দুঃখের কথা যে, বহুগামিতার প্রতি সহিষ্ণু হয়ে কোরান যেসব নিয়ম-কানুনের বিধান দিয়েছিল, সেগুলোকে মুসলমানরা প্রায়ই লঙ্ঘন করেছে। যেসব শর্ত সাপেক্ষে বহুগামিতার নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়েছিল, সেগুলোকেও খুব বেশি মেনে চলা হয়নি। বহুগামিতার বিষয়টাকে অত্যন্ত সাবধানে কেউ বিচার করে দেখেনি। যে-পরিবেশে ও যে-পরিস্থিতিতে বহুগামিতার পথ অনুসরণ করা যেতে পারে বলে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল, তার গুরুত্বকে কেউ অনুধাবন করেনি; বরং কোনো-কোনো সমাজের পুরুষরা বহুগামিতাকে গ্রহণ করেছে, শুধুমাত্র একাধিক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য।

অনেকেই, বিশেষ করে আরবিরা ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর বহুগামিতাকে একটা ব্যতিক্রমের বদলে নিয়মে পরিণত করে ফেলেছিল। তারা অবশ্য একসঙ্গে চারজন স্ত্রীর সঙ্গে থাকার নিয়মটাকে বজায় রেছেছিল। কিন্তু, যখনই তাদের ইচ্ছে হত, তখনই তারা তালাক দিতে শুরু করল। তারা জাগতিক সুখ ভোগ করার জন্য তালাক প্রথাকে ব্যবহার করত। তারা কিন্তু এ-ও জানত যে, তালাক আইনসিদ্ধ হলেও, পয়গম্বরের (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন, তাঁকে দোয়া করুন), কথা অনুযায়ী তালাক হল, "আল্লাহর চোখে সবচেয়ে সবচেয়ে ঘৃণ্য আইন।" তাছাড়া, বিরক্তিকর এই আইনি অনুমোদনকে কার্যকর করার ব্যাপারেও কোরানের স্পষ্ট বিধান আছে। দাম্পত্য সম্পর্কে যখন আর আন্তরিকতা থাকবে না, বা তা ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে, সবার প্রথমে সালিশির পথ নিতে হবে। কোরানে বলা হয়েছে:

যদি তোমার এই আশঙ্কা হয় যে, তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। তাহলে, স্বামীর পক্ষের লোকজনের মধ্য থেকে কাউকে সালিশ করার দায়িত্ব দিতে হবে। এবং স্ত্রীর পক্ষের লোকজনের মধ্য থেকেও একজনকে সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। দু'পক্ষই যদি যদি সবকিছু ঠিকঠাক করতে চায়, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের বিবাদের মীমাংসা হোক। (4:35)

সালিশ যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তালাকের প্রথম নিয়মটা প্রয়োগ করতে পারবে স্বামী। এই নিয়ম অনুযায়ী, তিন মাস দশ দিন পর্যন্ত তালাক মুলতুবি হয়ে থাকবে। ওই সময়টা পার হওয়ার পর তালাক চূড়ান্ত পর্বে এসে পৌঁছবে। তালাক মুলতুবি হয়ে থাকার পর্বে স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরেই থাকতে হবে, যাতে স্বামী তালাকের বিষয়টা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। কেননা, তালাক এক ধরনের আইনি সুরাহা হলেও, আল্লাহর চোখে তা ঘৃণ্য। তালাক নিয়ে পুনর্বিবেচনার পর্বটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরপর দু'বার কার্যকর হয়। তৃতীয় বার এই পর্ব কার্যকর হওয়া মানে আশু বিচ্ছেদ। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনকেই একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। তাদের ফের মিলন হতে পারে।

যদি ওই স্ত্রী আরেক পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পর, সেই পুরুষও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কোরানে বলা হয়েছে:

তালাক দু'বার উচ্চারণ করা যেতে পারে। তারপর বৈবাহিক সম্পর্ককে ন্যায্য ভাবে বজায় রাখতে হবে, বা ভাল ভাবে সেই সম্পর্কে ইতি টানতে হবে। (2:29)

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে (শেষ পর্যন্ত) তালাক দেয়, তাহলে সেই স্ত্রীকে আর তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে না। কিন্তু সেই স্ত্রী যদি পরে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, এবং সেই পরবর্তী পুরুষও যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে ফের সে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। তবে, পুনর্মিলিত স্বামী-স্ত্রীর এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তারা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনে চলতে পারবে। (2:230)

কোরান এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে সব বলে দেওয়া সত্ত্বেও মুসলমান স্বামীরা একসঙ্গে তিনবার তালাক বলে তিন তালাকের নিয়মটাকে দায়সারা ভাবে পালন করে নেয়। বৈবাহিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তালাক নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কোরানে যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই সময়সীমা সবাই যাতে মেনে চলে, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন কোনো-কোনো মুসলমান আইনজ্ঞ। তাঁদের মতে, তিন তালাকের নিয়মটাকে একসঙ্গে কার্যকর করলে বা একসঙ্গে পরপর তিনবার তালাক উচ্চারণ করলে, সেটাকে তালাকের প্রথম পর্ব হিসাবেই ধরা হয়। পয়গম্বরের পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবন অল-খতব লক্ষ করেছিলেন যে, তালাকের মতো গুরু-গম্ভীর বিষয়টাকে নিয়ে মানুষ এক প্রকার ছেলেখেলা করছে। তখন তিনি এই নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, তিনবার তালাক বললেই, তালাকের তিনটি পর্বই কার্যকর হয়েছে বল ধরে নেওয়া হবে। তদুপরি, পয়গম্বরও এ ব্যাপারে একটি নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেটা হল এই যে, নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে না। যেমন, স্ত্রীর ঋতুচক্র চলাকালীন বা দু'টি ঋতুচক্রের মধ্যবর্তী সময়ে, যদি ওই সময় যৌন সঙ্গম হয়ে থাকে (ঋতুচক্রের সময় সঙ্গম নিষিদ্ধ)। পয়গম্বরের একজন সতীর্থ আবদুল্লা ইবন ওমর এই নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে বলেছিলেন পয়গম্বর।

এসব দেখে বোঝাই যাচ্ছে, কোনো-কোনো মুসলমান সমাজে এমন শোচনীয় প্রথা চলে আসছে। এসবের ফলে কারো-কারো চোখে আমাদের আইনি ব্যবস্থাটা বিকৃত রূপে ধরা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, শরিয়ত কিন্তু অনন্য এক আইনি ব্যবস্থা হিসাবে টিকে গেছে। বিশেষ করে মহিলাদের সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং সাংবিধানিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থায় মানবাধিকার রক্ষার কথা

বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার দিকটাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতির সেবায় শরিয়ত যা কাজ করে, তা অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা করে না। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, শরিয়তের উজ্জ্বল দিকগুলো ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। কেননা, কোনো-কোনো মুসলমানের এমনই প্রবণতা যে, তারা ইসলামি আইনের শুধু সেই দিকগুলোকেই বড় করে দেখায়, যেগুলোতে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এরই ফলে ইসলাম সম্পর্কে প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অ-মুসলিম প্রাচ্যতত্ত্ববিদের কথা তো বাদই দিলাম, মুসলমানরা পর্যন্ত এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে। চোরের হাত কেটে দেওয়া বা ব্যভিচারীকে পাথর মারার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়নি; বরং মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য, তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই এর আগমন। মানুষ যাতে অপরাধ থেকে বিরত থাকে, তার জন্যই এইসব কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অবিলম্বে শাস্তি প্রয়োগ করাটা উদ্দেশ্য নয়। এটা প্রমাণিত হয় এই কথা থেকেই যে, শাস্তি প্রয়োগ করার আগে নানা নিয়ম-নীতির বাধা টপকাতে হয়। কোনো কিছু প্রমাণ করার চাপটা নেওয়া সহজ নয়। তাই শাস্তি প্রোয়গ করাটা বলতে গেলে এক প্রকার অসম্ভবই।

তাহলে এটা শুনে একটু আশ্চর্যই লাগবে যে, প্রকৃত ইসলামি সমজের বৈশিষ্ট্যই হল দয়া ও সহমর্মিতা। উচ্চ আদর্শের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য যা যা দরকার সে সবের মধ্যেও দয়া ও সহমর্মিতরও স্থান থাকতে হবে বলে ইসলামের নিদান। এমন এক সভ্য সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন আরও কিছু উপাদান। সে সবের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম হল, উচ্চ কর্মশক্তি সম্পন্ন মানুষ, যারা কিনা নিজেকে গড়ে তুলবে তাদেরই স্রষ্টার নির্ধারিত আদর্শে।

কিন্তু, জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকর্ষণের ফলে মুসলমানরা আল্লাহর অনুশাসন মেনে চলতে পারছে না। আচার ও আচরণে সম্পূর্ণ ইসলামি কোনো মুসলমান সমাজকে খুঁজে পাওয়ার আশা করাটা আজকের যুগে মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, আমি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ইসলামি আদর্শে চলা মানুষকে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট করে আমি যাঁর নাম উল্লেখ করতে পারি, তিনি হলেন ড. হাসান হাথুত। তাই তিনি যখন আমাকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর *মুসলিম মনন অধ্যয়ন* বইটির ভূমিকা লিখে দিতে হবে, তখন আমি সত্যিই খুব প্রীত হয়েছি। এই বইটি পড়ার আগেই আমি তাঁর চিন্তা-ভাবনা অধ্যয়ন করেছি। এরই সাহায্যে আমি 'বাস্তব আদর্শ' জগতের যাত্রাপথে পা বাড়াতে পেরেছি।

(Date 12.06.2021)

ইসলামকে ঠিক যে-অর্থে উপলব্ধি করা উচিত, ঠিক সেই অর্থেই উপলব্ধি করেন ড. হাথুত। তিনি যে আল্লাহ ও তাঁর একত্বকে বিশ্বাস করেন, তা শুধু এ জন্য নয় যে, তিনি আল্লাহর বাণী ও পয়গম্বরের শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছেন; বরং এ জন্যও যে, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড বৌদ্ধিক চর্চা করেছেন, যার ভিত্তি হল যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ। কোরানের বহু বাণীতেও এই মানসিক কসরতের কথা বলা হয়েছে। কোরানে বলা হয়েছে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে হবে, গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে, এবং অনুধ্যান করতে হবে; এসব করলে পরেই স্রষ্টার সম্পর্কে মানুষ অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। কোরান থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক:

স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে, এবং দিনের পর রাত ও রাতের পর দিন হওয়ার মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই মানুষের জন্য সব কথা বোঝার সংকেত লুকিয়ে থাকে। (3:190)

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও সামনের দিকে ঝুঁকে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, যারা স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা চিন্তে করে (এই বলে), "হে আল্লাহ! এসব তুমি অকারণে তৈরি করোনি। আল্লাহ হু আকবর।" (3:191)

তাই এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়, যার নাম "আল্লাহ", এমন এক পথ দেখিয়ে দিয়েছে, যা অনুসরণ করে একজন মুসলমান আল্লাহর সম্পর্কে জানতে পারবে, এ ভাবেই সে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং মনে-প্রাণে মেনে নেবে। তিনি একদিকে কাঁচা মনে প্রত্যয় স্থাপন করতে পারেন; অন্যদিকে, পরিণত মনের ও অবিশ্বাসী প্রাপ্তবয়স্কের মনেও বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন। আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে যে-দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোকে যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করার পর মানুষ প্রবেশ করে কোরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এখানে সে আল্লাহর অস্তিত্বের কার্য-কারণকে যুক্ত সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করে। সে বুঝতে পারে, আল্লাহর প্রকাশে মানবের মাঝে, পুনরুজ্জীবনে ও মরণোত্তর জীবনে, মানুষ ও পশুর মধ্যে থাকা পার্থক্যে, এবং তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যে। এই তিন ধর্মেরই সূচনা আদিপিতা আদমের সূত্র ধরে। এই তিন ধর্ম হল ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম।

এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের সঙ্গে অপর দুই ধর্মের সম্পর্ককে আকর্ষণীয় ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না-থাকা অ-মুসলিম পাঠক এই সম্পর্ক, বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে থাকা সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পারলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কোরানে আমাদের বলে,

... একটা কথা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে: "আমরা খ্রিস্টান।" এ কথা যারা বলে, তারা সবাই বিশ্বাসীদের প্রতি এক স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তাদের মধ্যেও রয়েছেন ইমাম ও সন্ন্যাসী, এবং তাঁরা কেউ উদ্ধত নন। (5.82)

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় এবং শিল্প-কলায় ইসলামি সভ্যতা সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছে। পাশ্চাত্য জগৎকে ইসলামি সভ্যতা একটা বনিয়াদ দিয়েছে, যার উপর পাশ্চাত্য জগৎ নিজের সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে। এ কথা বোঝা যায় এর থেকে যে, পাশ্চাত্য জগত বহু আরবি শব্দকেই উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং সেগুলোকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছে।

যেমন আরবি ভাষায় ইউনিভার্সিটিকে বলা হয় *জামিয়া*। এই *জামিয়া* শব্দটি এসেছে *জামি* শব্দ থেকে। যার অর্থ, কোনো শহর বা অঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর মসজিদ। এই মসদিজদগুলোতেই চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, আইন ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হত। শিক্ষকের চারদিকে গোল হয়ে বসে পড়ুয়ারা এসব কথা শিখত। এই ধারণাকেই অনুসরণ করা হল পাশ্চাত্য জগতে। তারাও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলল বিশেষ ভবন। সেই ভবনগুলোর তারা যে-নাম দিল, তার অর্থ আরবি শব্দ *জামিয়া*-র সঙ্গে মিলে যায়। লাতিন ভাষায় এই শব্দটা হল *ইউনিভার্সিতাস* এবং আধুনিক ইংরাজি ভাষায় একে বলা হয় ইউনিভার্সিটি। মুসলমান পড়ুয়ারা যখন সফল ভাবে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে, তখন তাদের যে-ডিগ্রি দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় *ইজাজাহ*। এই শব্দটার অর্থ একেবারে মিলে যায় *লাইসেন্স* শব্দটার সঙ্গে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিদ্যায়তনিক পাঠ সমাপ্ত করার যে-ডিগ্রি দেওয়া হয়, তারও নাম লাইসেন্স।

এতক্ষণে এটা জেনে যাওয়া উচিত যে, অতীতে ইসলাম ও খ্রিস্টানের মধ্যে যে সংঘাত ছিল, তার মূলে ছিল রাজনীতি। ধর্ম হিসাবে ইসলামের আবির্ভাবের জন্য এই সংঘাতের জন্ম হয়নি। এই বইয়ের লেখক দেখিয়েছেন যে, আজকের প্রভাবশালী সভ্যতাকে ইহুদি-খ্রিস্টান বলে উল্লেখ করাটা ঠিক নয়। এই সভ্যতার উপর প্রাচীন মুসলমানরা যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক তথ্যকে মুছে ফেলার জন্যই এসব বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের প্রভাব এমনকী বলতে গেলে ইহুদিদের চেয়েও বেশি। আজকের সভ্যতাকে বরং ইহুদি-খ্রিস্টান-ইসলামি বলাই সংগত হবে। এই অধ্যায়েই প্রকাশ পেয়েছে, ইহুদিদের পয়গম্বর মোজেসকে কোরান কতখানি শ্রদ্ধা করে। মোজেস ও তাঁর অনুগামীরা যে-সংগ্রাম করেছেন, সেই গাথা কোরানে বেশ কয়েক বার বর্ণনা করা হয়েছে। বলতে গেলে, পয়গম্বর মহম্মদের চেয়েও মোজেসের নামই বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে কোরানে। মোজেস ও পয়গম্বর— দু'জনকেই আল্লাহ শান্তি দিন এবং দোয়া করুন। ইসমায়েল, ইসাক, জেকব, মোজেস, আরন,

ডেভিড, সোলোমন ও জোসেফ প্রমুখ পয়গম্বরের নাম ইসলামি সম্প্রদায়ের মধ্যেও জনপ্রিয়। এসব থেকেই বোঝা যায়, মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে যে-সংঘাত, তা আসলে রাজনৈতিক, এ কোনো ধর্মীয় সংঘাত নয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ইহুদিরাই সম্ভবত সবার আগে এ কথা মেনে নেবে যে, অন্য কোনো স্থানের চেয়ে ইসলামি রাষ্ট্রেই তারা বেশি সুরক্ষিত বোধ করে এবং ভাল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। স্পেনে যখন ইসলামি শাসনের অবসান হল, তখন ইহুদিরা সেখানকার নতুন শাসকদের থেকে পালিয়ে চলে যায় আরও এক ইসলামি রাষ্ট্রে। সেই রাষ্ট্র ছিল অটোমানদের।

একই রকম ভাবে, ইসলামি ও খ্রিস্টীয় জগতের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক অনেক বেশি মজবুত হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এই দুই ধর্মের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, তা পারস্পরিক শত্রুতার কথা বলে না; বরং এই দুই ধর্মের মধ্যেই অভিন্ন কিছু স্বার্থ আছে, যেগুলো পূরণ করার জন্য মুসলমানদের উপর এতদিন ধরে চলে আসা এবং এখনও চলতে থাকা একের পর এক অন্যায়ে ইতি টানতে হবে। যুগ-যুগ ধরে যে-তিক্ততা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, সেগুলোকে দূর করে সেই অন্যায়ে ইতি টেনে পরস্পরের হাত ধরতে হবে।

কোরানের দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল চতুর্থ অধ্যায়। এখানে ইসলামের অবয়বকে সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরিয়ত বা ইসলামি আইনের কাঠামোকে, রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করে রাখার বিষয়টিকে, এবং গণতন্ত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করে দেখেছেন হাথুত। ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। যেমন, নমাজ ও নৈতিক বাণী। যা মুসলমানদের নিয়মানুবর্তী করেছে, এবং যা কিছু ভাল সেগুলোর প্রতি তাদের মনে দয়া, ক্ষমা ও প্রেমের ভাব জাগিয়ে তুলেছে। শরিয়তের খুবই আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা হাথুত তুলে ধরেছেন। তাঁর সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যোগ করতে চাই। সেটা হল এই যে, দু'টো জিনিসকে স্পষ্ট ভাবে পৃথক করতে হবে। একদিকে রয়েছে কোরানের নীতি ও আদেশ, যার সংখ্যা খুবই কম, এবং পয়গম্বরের পরীক্ষিত বাণী ও কর্মে মূর্ত হয়ে থাকা নীতি-নিয়ম। এসব কিছু মিলে তৈরি হয়েছে আইনের এক পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় উৎস। অন্যদিকে আছে আইন বিষয়ক বিপুল সংখ্যক মতামত। যেসব মতামত যুগ-যুগ ধরে পোষণ করে এসেছেন বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত। দ্বিতীয় যে-আইন বা নিয়মগুলোর কথা বলা হল, সেগুলো ধর্মীয় দিক দিয়ে মুসলমানরা মেনে চলতে বাধ্য নন। তাই সেগুলোকে পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয় না।

আইনজ্ঞদের মতে, ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হল *মসালিহ মুরসলাহ*।

এই দু'টো শব্দকে মোটামুটি অনুবাদ করলে যে-অর্থ দাঁড়ায়, তা হল 'জনস্বার্থ'। পয়গম্বরের জীবদ্দশায় যেসব পরিস্থিতি কখনো দেখা দেয়নি, সেসব পরবর্তী কালে যখন উদয় হতে লাগল, তখন সেগুলোকে সামাল দেওয়ার জন্য প্রথম দিককার আইনজ্ঞরা এই উৎসের দ্বারস্থ হতেন, তাই এগুলোকে মূল গ্রন্থে অর্থাৎ কোরান ও সুন্নাহতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আইনজ্ঞরা আবার এই জনস্বার্থ নীতিকে এমন ভাবে ব্যাবহার করতেন যে, তার সাহায্যে তাঁরা মূল গ্রন্থে উল্লিখিত প্রতিবিধানকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কোনো-কোনো আইনজ্ঞ তো আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। যখনই মূল গ্রন্থের প্রতিবিধান ও জনস্বার্থ নীতির মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছে, তখন তাঁরা জনস্বার্থ নীতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এসব সংস্কারমূখী পদক্ষেপের কথা কল্পনা করাও কষ্টকর।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নতুন সমস্যা দেখা দিল, এবং তার সঙ্গে ইসলামি সম্প্রদায়ের চাহিদাও পরিবর্তিত হতে লাগল। এসবের সমাধান খোঁজার কাজ অব্যাহত রয়েছে অনবরত। সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্যই শরিয়ত গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। এটা গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল পয়গম্বরের মৃত্যুর ঠিক পরে-পরেই। নানা পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যাঁরা খুবই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবন অল-খতব। তিনি কোরানের প্রতিবিধানগুলোকমে মেনে নেওযার পাশাপাশি কোনো-কোনো প্রতিবিধানকে সম্পূর্ণ বর্জন করার পথেও পা বাড়িয়েছিলেন।[১] আমার এই ভূমিকা অবশ্য এসব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার উপযুক্ত জায়গা নয়। তাই আমি শুধু *ইজতিহাদ* বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা পার্থক্যের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকব। *ইজতিহাদ* মানে হল আইন বিষয়ক যুক্তি-বিচার। এক দল মনে করে, মূল গ্রন্থের কথাগুলোকে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলতে হবে, এসবের উদ্দেশ্য নিয়ে বেশি মাথা না-ঘামালেও চলবে। অপর দল মনে করে, কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন বিচার-বুদ্ধিতে কোনো আইন বলবৎ করা দরকার, সে-দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ড. হাথুত একদল সৈন্যের একটি গল্প বলেছেন। সেই সৈন্যদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বানি কুরাইদা অঞ্চলে না-পৌঁছনো পর্যন্ত তারা যেন অসর (মধ্য অপরাহ্নের নমাজ) না-করে। তা হল কি, অসর নমাজের সময় শেষ হয়ে আসছে, অথচ তারা কেউ-ই নিজেদের গন্তব্যে তখনও পৌঁছতে পারেনি। তখন কোনো-কোনো সৈনিক নমাজ শুরু করে দিলেন। তারা পয়গম্বরের আদেশকে এই বলে ব্যাখ্যা করল যে, পয়গম্বর নমাজ কোরো না বলেননি; বরং তিনি বলেছেন, নিজের গন্তব্যের দিকে প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আরেক দল সৈন্য আবার পয়গম্বরের আদেশকে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গন্তব্যে

না-পৌঁছনো পর্যন্ত নমাজ করলেন না। পরে পয়গম্বর (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন এবং তাঁকে দোয়া করুন) উভয় দলকেই বলেছিলেন যে, তারা ঠিকই করেছে। কেননা, উভয় দলেরই যুক্তি অকাট্য। উমর ইবন অল-খতবের ইজতিহাদ হল সেই গোষ্ঠীর, যাঁরা মনে করেন, মূল গ্রন্থকে অক্ষরে-অক্ষরে পালন না-করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য ও যুক্তি বিচার করে আইন প্রণয়ন করা উচিত। নতুন-নতুন যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে, এবং যেসব পরিস্থিতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েই চলেছে, এমন সব পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য ড. হাথুত যে-মত পোষণ করেন, সে-সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পর আমার মনে হয়েছে যে, তিনিও উদ্দেশ্য ও যুক্তি বিচার করা গোষ্ঠীর পক্ষে রয়েছেন।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের সম্পর্ককে খুব ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। কোরান ও সুন্নাহতে যে-ইসলামি সরকার স্থাপনের প্রতিবিধান দেওয়া হয়েছে, তাতে সাংবিধানিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই; বরং ওই মূল গ্রন্থগুলিতে যেসব মূল নীতির কথা বলা হয়েছে, সে সবের উপর ভিত্তি করে যে-কোনো ঘরনের সংবিধান রচনা করা সম্ভব। সেখানে বলা হয়েছে, শাসককে নির্বাচন করবে অন্য লোকেরা, এবং শাসকের কাজ হবে আইন মেনে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জনগণের জন্য কী কাজ করতে হবে, সে-বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে মান্য বলে ধরা হবে। এটাই হল শুরা প্রণালীর মূল কথা। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েও পয়গম্বরকে শুরার নিয়ম মেনে চলতে হত। যখন তাঁকে আল্লাহর বাণী মেনে চলতে হত, তখন তাঁকে শুরার নিয়ম মানতে হত না। সমস্ত বিষয়ে শুরার নিয়ম কী ভাবে মেনে চলতে হবে, তা সময় ও স্থান অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে বলা হয়েছে। তার মানে এখানে নমনীয়তার মতো এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। উমরের খেলাফত সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক এখানে। তিনি সাধারণত মসজিদেই শুরার বৈঠকের আয়োজন করতেন। কিন্তু জটিল কোনো বিষয় বা বিস্তর আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় নিয়ে চর্চা করার জন্য তিনি শহরের বাইরে প্রকাশ্য স্থানে বসে বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মত বিনিময় করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না-হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন সেখানে আলোচনা চলতেই থাকত। অবশেষে যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তা শাসককেও মেনে চলতে হত।

শুরা ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে ইসলামে। সেই সঙ্গে ইসলাম মানবাধিকারের বিষয়টিকেও সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করেছে। বহু দেশ নানা জটিল-কুটিল পথের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিজেদের শাসন ব্যবস্থায় উপাসনার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও গতিবিধির স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং দেশের সব নাগরিকের মধ্যে সাম্য রক্ষার কাজ করেছে। কিন্তু ইসলামে এসব কাজ বহু আগেই করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য এই যে, ইসলামের সেই উষা লগ্নের পর থেকে অনেক

কিছু বদলে গেছে। ইসলামি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যেসব আদি বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলোও কালের গতিতে ক্ষয়ে গেছে। কোনো-কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের দিকে তাকালে এ কথা মনে হতে বাধ্য যে, ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বিরোধ আছে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিয়ে লেখক স্পষ্ট অথচ সুসংহত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এই মূল স্তম্ভগুলোর কথা মুসলমানরা সাধারণত ছোটবেলাতেই শিখে নেয়। একজন মুসলমান তার স্রষ্টার সঙ্গে পরম সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, নমাজ অদা করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর আদেশ পালন করার ব্যাপারে, এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য কী অবিচল প্রয়াস অব্যাহত রাখে, তার একটা স্পষ্ট চিত্র অ-মুসলমান পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্যই লেখক ওই স্তম্ভগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর পরেই আছে মুসলমানদের জীবনের আরেকটি অঙ্গ। সেটা হল, অন্যদের প্রতি ব্যবহার ও আচরণ। যাঁরা মুসলমানদের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে চান, তাঁরা এই দিকটির প্রতিই সহজে আকৃষ্ট হন। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিকতার এক উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এর মধ্যে জীবনের সমস্ত দিককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নৈতিকতার জোরেই একজন প্রকৃত মুসলমান হয়ে ওঠেন উদার, সহিষ্ণু ও বিনয়ী। তিনি অন্যান্য মুসলমানদেরও ভাল করার চেষ্টা করেন, ঠিক যেমনটা তিনি চেষ্টা করেন নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য।

কোরান ও সুন্নাহ থেকে লেখক সেই সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক-এক করে তুলে ধরেছেন, যেসবের প্রভাব শ'- শ' বছর ধরে মুসলমানদের উপর পড়েছে। এসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে অ-মুসলমানদের সামনে লেখক প্রগাঢ় এক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলাম আসলে কী।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে লেখক সেই সব রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন, যেগুলো নিয়ে সারা বিশ্বে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক চলছে। লেখক যে-মত পোষণ করেছেন এবং সমাধানের যে-পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেসব পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি ইসলামি শরিয়ত ও তার প্রবর্তিত নৈতিক আদর্শগুলিকে গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন। কোনো-কোনো মুসলমান হয়তো লেখকের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেও পারেন। ইসলাম অবশ্য ভিন্ন মতকেও গ্রহণ করে নেয়। এ ব্যাপারে আমাদের পয়গম্বর এই বিধান দিয়েছিলেন, "যখন কেউ সত্য বা কোনো সমস্যার সমাধানের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, এবং সঠিক উত্তর খুঁজে পায়, সে তখন দু'টো পুরস্কার পায়। যে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েও সত্যের সন্ধান পায় না, সে পায় একটা পুরস্কার।" আমি মনে করি, ড. হাথুত মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অর্থই শুধু খুঁজে বের করার প্রয়াস পাননি, বরং তিনি সারমর্ম ও প্রজ্ঞার সন্ধানে ব্রতী থেকেছেন। তাই তিনিও

একটি নয়, দু'টি পুরস্কার পাবেন।

* শেখ আহমদ জ়াকি য়ামানি হলেন সৌদি আরবের প্রাক্তন পেট্রোল ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী। এ ছাড়া, তিনি আমাদের সময়কার একজন কৃতবিদ্য রাষ্ট্রনায়ক। তিনি নিজ গুণেই ইসলামি বিষয়ের একজন পণ্ডিতও বটে। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শরিয়তের পাঠ্যক্রমে প্রত্যেক বছর অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের নানা বিষয় ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ *দি এভারলাস্টিং শরিয়ত* (চিরায়ত শরিয়ত) (সৌদি পাবলিশিং হাউজ, 1970) এবং তাঁর অজস্র রচনা ও বক্তৃতা বহু দূর পর্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে। ইংল্যান্ডের লন্ডনে অবস্থিত প্রখ্যাত সংস্থা সেন্টার ফর গ্লোবাল এনার্জি স্টাডিজ-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। তিনি অলফুরকান: দি ইসলামিক হেরিটেজ ফাউন্ডেশন-এরও প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। এই সংস্থা প্রাচীন ইসলামি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, নথিভুক্ত ও প্রকাশনার কাজ করে।

+ সুন্নাহ: এর আক্ষরিক অর্থ হল "জীবন ধারণের উপায়, পথ, নীতি, পদ্ধতি বা জীবনচর্যা"। পয়গম্বর মহম্মদের জীবনচর্যার দৃষ্টান্তকে তুলে ধরার জন্য ইসলামি সাহিত্যে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটা হল ইসলামি আইনের দ্বিতীয় মূল উৎস। সম্পাদিত।

++ খলিফা উমরের সিদ্ধান্ত কোরানের আদেশের পরিপন্থী নয়; বরং তিনি সেই আদেশগুলোকে নিজের মতো করে বুঝে ও ব্যাখ্যা করে তাঁর দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির নিরিখে নিজের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সময় পয়গম্বরের যে-সকল প্রাজ্ঞ সতীর্থ বর্তমান ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়েই উমরের উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছিল। তাঁরা উমরের সঙ্গে সহমত ছিলেন। উমর যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সেই সকল প্রাজ্ঞ সতীর্থদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে নিতেন।

আত্মকথন

ব্রিটিশ শাসনের সময় আমি ইজিপ্টে জন্মেছিলাম। এটা আমার জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল, ছোট্ট শিশু রূপে আমার সবচেয়ে আগের যে স্মৃতি মনে পড়ে তা হল আমার মা বারবার আমায় ডেকে চলেছে, 'আমি যখন তোকে বহন করছিলাম, একটা শপথ নিয়েছিলাম তোকে ডাকতে হাসান এবং তোকে উৎসর্গ করেছি ইজিপ্ট থেকে ব্রিটিশ তাড়ানোর লক্ষ্যে।' এটা আমার মনে খুব শক্তিশালীভাবে গেঁথে ছিল। ফলাফল? বাল্যকালে কোনো খোলামেলা পরিবেশ পাইনি এবং না পেয়েছি মধুর কৈশোর। জীবনে একটা কারণ আর উদ্দেশ্য ছিল!

আমাদের প্রজন্ম ঠিক তার আগের প্রজন্মের জুতো পরেছিল একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে যেভাবেই হোক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ব্রিটিশ এবং তাদের সারোগেট ইজিপ্ট সরকারের কাছে আমরা ছিলাম জঙ্গি, আর বাকি দেশ ও পৃথিবীর কাছে আমরা ছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমরা ভাগ্যবান যে ব্রিটিশ শাসন শেষ হতে দেখেছি। যখন আমি পড়াশোনা করার জন্য ব্রিটেনে থাকতাম, ব্রিটিশ মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে সরকার ও রাষ্ট্রদূতদের পররাষ্ট্র নীতি থেকে মানুষ একেবারে অন্যরকম হতে পারে। এটা আমার ক্ষেত্রেও বহু পরে ঘটেছিল, যখন আমি আমেরিকায় এসেছিলাম এটাকে আমার ঘর বানাতে।

গাম্ভীর্য ও সমাধান আমার বিদ্যায়তনিক জীবনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। অবস্ট্রেট্রিক্স ও গায়নোকলোজিতে আমার উচ্চতর ক্লিনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন পার হয়ে একটি জমাট বিদ্যায়তনিক ভিত্তি নিশ্চিত করতে আমি পিএইচডি করেছিলাম স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমার গবেষণার বিষয় ছিল, 'স্টাডিজ ইন নর্মাল অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল হিউম্যান এমব্রায়োজেনেসিস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার ছোটবেলার স্বপ্ন সাকার করে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম, আমি ছিলাম আমার বিভাগের চেয়ারম্যান, ক্লিনিশিয়ান, বিজ্ঞানী

ও শিক্ষক এবং আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আমার পেশাদারি বৃত্তে খুব উঁচুতে পৌঁছেছিলাম।

এসবই, যদিও, ছিল আমার ফুসফুলের একটি দিক, যা দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চলত। আমার অন্য ভালোবাসা ছিল ধর্ম সম্পর্কিত পড়াশোনা, প্রাথমিকভাবে আমার নিজের ধর্ম, কিন্তু এইসঙ্গে অন্যদেরও। ধর্ম বিষয়ক ছাত্রছাত্রীর চেয়ে আমার অধ্যয়ন খুব বেশি ব্যাপক ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞান ও ওষুধে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে দিয়েছিল অসীম মূল্যবান একটি হাতিয়ার যার দ্বারা আমি নিজের ধর্মকে বুঝতে ও একে ব্যাখ্যা করতে শিখেছি।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশেলে বড় হওয়া ও বহুভাষিক হওয়ার সূত্রে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তৃতভাবে পরিচিত যা এটা নয় তার জন্য (এবং কখনো আমি আমি অনুভব করি যে মুসলমানরা নিজেই এ জন্য দায়ী)। সক্রিয় দোষারোপ ও ইসলামের অসম্মান করাটাই এখন রাজনীতি, মিডিয়া ও আন্তেপ্রেনিউয়ার ক্ষেত্রের কয়েকটি গোষ্ঠীর মিশন ও কেরিয়ার হয়ে উঠেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা হল প্রাথমিক মানবাধিকার যে একজন যা সেভাবেবেই তাকে জানা উচিত। এইসঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের মাঝে শান্তি, সম্প্রীতি ও শুভ চেতনা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র সঠিক উপলব্ধির ফলে কাল্পনিক কাহিনি বা মিথ্যের ওপর নয়। মানুষ তাহলেই সত্যিকারের সামঞ্জস্য ও তারতম্য সম্পর্কে সচেতন হবে, এবং তাদের ব্যবধান-তারতম্যকে সম্মান করবে ও সহিষ্ণু হবে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে পারবে।

ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে এই বইটি সেই যাত্রার দিকে সামান্য অবদান, ইসলাম হল সেই আস্থা যা আছে আমাদের প্রতিবেশী এক বিলিয়ন মানুষের।

আমি এটা ভালোবাসায় উপস্থাপন করি।

আল্লাহ থেকে আসে ভালোবাসা, শয়তান থেকে ঘৃণা।

হাসান হাথুত

প্রথম অধ্যায়
ঈশ্বর?

আমার নাতনিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?' সে প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিল, 'অবশ্যই!' এবং তারপর, তার শ্বাস রোধ করে যে যোগ করল, 'মা-ও এরকম বলে!' কিন্তু তখন আমি ওর একটা বই তুলে নিই এবং জিজ্ঞেস করি, 'এই বইটা কে লিখেছেন?' এবং সঙ্গে সঙ্গে সে লেখকের নাম পড়ল। তর্ক চালিয়ে যেতে আমি বললাম, 'ধরো, আমি প্রথম পৃষ্ঠায় লেখকের নাম ঢেকে তোমায় বললাম এই বইটিই এই বইটি লিখেছে, কোনো লেখক ব্যতিরেকে, তাহলে তুমি কী বলবে?' ওর প্রত্যুত্তর ছিল একেবারে স্বাভাবিক 'অসম্ভব।' এবং আমাদের বাকি আলোচনা মসৃণ ও যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করল যে একটি বই যেমন একজন লেখকের প্রমাণ ঠিক একইভাবে সৃষ্টি হল সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ।

সরল এবং সহজ, কিন্তু কোনো মুসলমানের ভাবনায় এটাই কেন্দ্রীয় চেতনা। এটা ছিল হয়তো একইরকম বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া যা কুলপতি আব্রাহামকে (পয়গম্বরদের ঈশ্বর নামেও ইসলামে পরিচিত) চালিত করেছিল ঈশ্বরকে খুঁজতে। ধর্মগ্রন্থ ও উপাসনায় জনগণের ভুল বিশ্বাসে বিরূপ হয়ে তিনি কল্যাণের জন্য প্রকৃতির প্রবন্ধ বিবেচনা শুরু করেন, যেমন নক্ষত্র, চাঁদ ও সূর্য, শুধু এটা খুঁজতে যে সবই নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে বাধ্য, সেজন্য তিনি গুরুত্ব দেন যিনি এইসব আইন স্থির করেছেন সেই শক্তি-র দিকে। কোরানে এটা খুব চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে :

সেজন্য আমরাও আব্রাহামকে দেখিয়েছিলাম স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকৃত অঞ্চল, যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন।

যখন রাত্রি তাঁকে আবৃত করেছিল তিনি একটি নক্ষত্র দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'এই আমার প্রভু', কিন্তু যখন এটা অস্তমিত হল, 'যা অস্তমিত হয়েছে তাকে আমি ভালোবাসিনি।' যখন তিনি দেখলেন চাঁদ উঠেছে পূর্ণ

সৌন্দর্য নিয়ে, তিনি বললেন, 'এই আমার প্রভু', কিন্তু যখন চাঁদ ডুবে গেল, তিনি বললেন, 'আমার প্রভু আমাকে পথ না দেখালে আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের মতো হবে যারা যায় বিপথে।' যখন সূর্য উঠল পূর্ণ কিরণে, তিনি বললেন, 'এই আমার প্রভু, এটা বৃহত্তম।' কিন্তু যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন, 'ও আমার জনগণ... আমি প্রকৃতই মুক্ত তোমাদের (পাপ) সঙ্গী দেওয়া থেকে (একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরকে)। আমার জন্য, আমি আমার মুখ দৃঢ়ভাবে স্থির করেছি এবং সত্যিই তাঁর দিকে যিনি এই স্বর্গ ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো তাঁকে সঙ্গী দেব না।' (6: 75-78)

যদিও ঈশ্বরের ভাবনা এত জনপ্রিয় নয় যেমন সবাই কল্পনা করে। আমি এটা দেখে অবাক হয়েছি যে শুধু প্রাক্তন কমিউনিস্ট ব্লকের নয়, আমেরিকা ও ইউরোপের বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে আমার সহকর্মী অনেক বিজ্ঞানী ছিলেন নাস্তিক। আমিও আমার জীবনের একটা সময়ে প্রবলভাবে নাস্তিক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমার স্বদেশ ইজিপ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই চেষ্টা বিফলে যায়। আমার সমবয়সিদের মধ্যে আমি এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কখনো ঈশ্বরহীন ব্রহ্মাণের ধারণায় নিজেকে আবদ্ধ রাখিনি। এই বিষয়টি অবশেষে ছাড়তে হল যখন এক সন্ধেয় আমি একটি শব্দের অর্থ দেখতে অভিধান খুললাম এবং আমার মাথায় একটা ভাবনা এল : ধরা যাক, কেউ আমায় বলল যে অভিধানে সজ্জিত সব শব্দ হল ছাপাখানায় একটা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট, যার কারণে সব অক্ষর ফুটে উঠেছিল এবং তারপর তাদের পতন ঘটে, একেবারে বর্ণানুক্রমিকভাবে, যেভাবে এগুলো অভিধানে রয়েছে। আমার মাথা কিছুতেই এটা নিতে পারেনি!

যদি তিনিই হন পরম সৃষ্টিকর্তা, তাহলে কোনোকিছুই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়, না হলে 'তিনি' যে কোনোকিছুর চেয়ে 'কম'। তাহলে তাঁর সীমাবদ্ধতা থাকত এবং যা পরম একক-এর সঙ্গে মানানসই হত না অথবা প্রাথমিক কারণ বা দর্শন বলে। তাঁর ব্যাপকতা সর্বত্র। তাঁর অবদান প্রকাশ করা যায় অসীমের মধ্য দিয়ে। অঙ্কের বিজ্ঞান অসীমকে প্রকৃতার্থেই একটি আঙ্কিক সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রকাশ করা হয় বিশেষ চিহ্ন দ্বারা। অবশ্যই আমাদের সঠিকভাবে বোধগম্য হয় না অসীম বলতে বাস্তবিক কী বোঝায়, কিন্তু আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত যে এটা শুধুমাত্র স্বাভাবিক, আমরা যেহেতু সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধতা কিছুতেই অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না। সেজন্য ইশ্বর আমাদের উপলব্ধি করেছেন এবং আমরা, আমাদের যাবতীয় বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারি না, আমরা তাঁর সম্পর্কে জানি তাঁর চিহ্ন ও ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এবং যেহেতু অসীমকে দুই বা তিন বা তার বেশি ভাগে ভাগ করা যায় না (এটা আঙ্কিক সত্য) তাই বলা

যায় ইহুদিদের জন্য একজন ঈশ্বর, খ্রিস্টানদের জন্য একজন, মুসলমানদের জন্য আরেকজন, হিন্দুদের জন্য আরেকজন, আবার ঈশ্বরহীনদের জন্য আরেকজন... এরকম হতে পারে না। ঈশ্বর এক এবং অনাদি। ইসলামের আস্থা ও মুসলমানদের বিশ্বাসের শিকড় হল এই ঈশ্বরের এককত্ব।

যখন ঈশ্বর বোঝাতে 'তিনি' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, অবশ্যই এর মধ্যে কোনো লিঙ্গবাচক ধারণা থাকে না। ঈশ্বর এই ধরনের শ্রেণি বিভাজনের ঊর্ধ্বে এবং লিঙ্গের প্রশ্ন আসে এর পারিভাষিক ব্যবহারে, যা সীমিত ও আইনি। ভাষার ক্ষেত্রে বলা যায়, এটা মনে রাখতে হবে যে কয়েকটি ভাষায় (ইংরেজি সহ) একমেবাদ্বিতীয়ম পরম সৃষ্টিকর্তা বোঝানোর মতো একটি একক শব্দ নেই, সুতরাং 'God' শব্দটি বড় হরফে লেখা আবশ্যক (মনুষ্য সৃষ্টি) 'God' শব্দ থেকে পৃথক করতে, যেগুলি শুরু হয়েছে ছোট হরফের 'g' দিয়ে। অন্যান্য ভাষাতেও

তাঁর জন্য একটি বিশেষ নাম সংরক্ষিত। আরবি ভাষায় এটা হল আল্লাহ। গড (ইংরেজি), দিউ (ফরাসি), আদোনাই (হিব্রু) অথবা আল্লাহ (আরবি) যে ভাষাতেই কেউ পড়ুক না কেন, এর মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। মাঝে মাঝেই আমার ভাষণের সময় আমি শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাহলে আল্লাহ কে?' কখনো রেফারেন্স এত নিষ্পাপ থাকে না, কেননা কিছু পণ্ডিত আছেন যাঁরা খুব ভালোই বলতে পারেন যে মুসলমানরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করে না, তাঁদের এক পৃথক ঈশ্বর আছেন, একেবারে নিজস্ব, যাঁকে তাঁরা ডাকেন আল্লাহ!

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাহলে কী?
ইসলামের ধর্মবিশ্বাস

ঈশ্বর আছেন।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, 'তাহলে কী?' ঈশ্বর আছেন কি না তাতে কি আমাদের সত্যিই কিছু এসে যায়, অথবা এই প্রশ্নটা কি শুধুমাত্র একটি বিদ্যায়তনিক জিজ্ঞাসা, যাতে শুধু ধর্মতাত্ত্বিক ও দর্শনতাত্ত্বিকদেরই আগ্রহ আছে? মানব সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রাসঙ্গিকতা কী এবং তাঁর অস্তিত্বের (বা অনস্তিত্বের) বাস্তব প্রয়োগের প্রমাণ কোথায়?

ঈশ্বর আছেন অনুমান করি, এবং অনুমান করি তিনিই পরম সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্টির একটি অধ্যয়ন সঙ্গে সঙ্গে দেখায় যে আমাদের, মানুষ, খুব সুস্পষ্ট তফাত আছে জগতের অন্যান্য জীবের সঙ্গে, যতদূর এখন পর্যন্ত জানা গেছে। অণু থেকে মহাকাশ, সবই একটি নিয়ম মেনে চলে যা তাদের পরিচালনা করে। আমাদের শরীরের অণু ও পরমাণুর উপাদান প্রকৃতির অণু-পরমাণুর মতো একই, এবং আমাদের অভ্যন্তরে এগুলি সেই একই নিয়ম মান্য করে। যেহেতু এগুলো আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (আত্ম-উপস্থাপনকারী অণু যা জীবনের মৌলিক উপাদান) গঠন করে, জীববিদ্যার সঙ্গে রসায়ন মিশে যায়, যা তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। এক্ষেত্রে আমরা আশ্চর্যভাবে পশুদের তুলনায় একইরকম।

যখন আমি স্কুলে ছিলাম, আমাদের শেখানো হয়েছিল মানুষ (মহিলা ও পুরুষ ব্যতিরেকে) হল পশুজগতের প্রধান। যদিও, যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমরা নিজেদের পশু হিসেবে স্বীকৃতি দিই না। যদিও আমাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুদের মতোই যেমন সংবহন, শ্বসন, পাচনক্রিয়া, বিপাক ক্রিয়া, সহনশীলতা, লোকোমোশন, সংবেদনশীলতা, প্রজনন প্রভৃতি, এইসঙ্গে আমরা এটাও জানি যে শুধু আমাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া আমাদের মানব করেনি। আমরা যত প্রজাতি অধ্যয়ন করেছি তার মধ্যে আমরাই একমাত্র সেই প্রজাতি যে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ঊর্ধ্বে। আমরা হলাম সুপারবায়োলজিক্যাল জীব যাদের আচরণের ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াই একমাত্র নির্ণায়ক নয়। পশুদের মতো আমাদের সেই একই প্রবণতা ও তাড়না থাকে, কিন্তু পশুরা যেখানে সেগুলিতে একটিমাত্র পদ্ধতিতে সাড়া দেয়, আমাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত জটিল মেকানিজমে যা অভ্যন্তরস্থ প্রোগ্রামিং ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে যেতে পারে। আমরা হয়তো আমাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি, কিন্তু আমরা অবশ্যই মূল্যবোধ, নীতি ও আধ্যাত্মিকতায় শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে উঠে যাই। প্রকৃতার্থে, এটা অত্যন্ত সত্যি কথা যে আমরা হলাম আধ্যাত্মিক জীব, রয়েছি বায়োলজিক্যাল পাত্রে (আমাদের শরীর)। আমাদের মধ্যে যারা তাদের শারীরবৃত্তীয় উপাদানের জন্য জীবনের প্রয়োজন (ও লোভ) পূরণের কথাই শুধু ভাবে এবং যাদের অধ্যাত্মবোধ নেই তাদের পশু হিসেবে বর্ণনা করা যায়, অন্তত আকৃতিগতভাবে।

মানুষকে অধ্যয়ন করার পর আমরা উপলব্ধি করেছি যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের চমৎকার চারটি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করেছেন যা আমাদের প্রজাতিতে অনন্য : জ্ঞান, শুভ ও অশুভ সম্পর্কে সচেতনতা, পছন্দের স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা।

জ্ঞান : জ্ঞানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে এবং আমরা চাই এটা আরও আরও বেশি অর্জন করতে। আমাদের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ, কল্পনা, সমতা, বিশ্লেষণ, নিরীক্ষা ও উপসংহারের জন্য সজ্জিত। আমরা জানতে চাই অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং আমাদের চারপাশের সুন্দর প্রকৃতিকে এবং আমরা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের জ্ঞান নথিবদ্ধ ও প্রকাশ করি।

শুভ ও অশুভ সম্পর্কে সচেতনতা : আমরা খুব সাধারণভাবে প্রত্যাশা করি যে শুভ সবসময় হবে আকর্ষণীয় এবং

অশুভ হবে বীভৎস। মানব জীবনের জটিলতা, মানব মনের উপস্থাপনা ও সমতার দিকে এর যাত্রা এবং এই সত্য যে অশুভ হতে পারে খুবই প্রণোদনামূলক, নিশ্চিতভাবেই চালচিত্রকে পরাভূত করে, শুভ ও অশুভ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা আমাদের অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।

পছন্দের স্বাধীনতা : আমাদের পছন্দের অধিকারের শিকড় এসেছে 'স্বশাসিত'

থেকে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা যা দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। অবশ্যই এই স্বাধীনতা চরম নয় এবং সীমাবদ্ধ স্তরে সম্প্রসারিত, যার উপরে এটি আর চালনা করা যায় না। যদিও, এই স্তরের ভেতরে, স্বাধীনতা হল একটি অপরিহার্য মূল্যবোধ যা মানবজীবনে পরম গুরুত্বপূর্ণ।

দায়বদ্ধতা : এটা হল পছন্দের স্বাধীনতা যা মানুষের দায়বদ্ধতার আধার। আমরা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করি যে আমাদের পছন্দের জন্য শুধু আমরাই দায়বদ্ধ এবং সেজন্য দায়িত্বও নিতে হবে আমাদেরই। এটা ধর্মের কোনো চমৎকারিত্ব নয়, এমনকি কোনো নাস্তিক সমাজেও আপনি যদি ট্রাফিক সিগন্যাল ভঙ্গ করেন আপনাকে জরিমানা করা হবে। ধর্মবোধের অধীনে দায়বদ্ধতা বোঝায় যে কতক্ষণ না কেউ মুক্ত হচ্ছে, কারো বিচারের বা ডে অব জাজমেন্ট-এর মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়। সেজন্য স্বাধীনতাকে বলা যেতে পারে মানুষ হওয়ার মূল বিষয় ও মূল চেতনা, এটা আসে একটি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় চেতনা থেকে। ঈশ্বর একটি প্রজাতির সৃষ্টি করেছেন যে তার ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়িত্ব বহন করবে, সুতরাং ঈশ্বর যে প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন তার হলমার্ক হল স্বাধীনতা। যেসব ঘটনা আমাদের পছন্দের স্তর বা সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে থাকে প্রভাব ফেলতে সেগুলি 'ভাগ্য'-এর বিষয়, এবং অবশ্যই এগুলির জন্য আমাদের কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না।

সুতরাং আমরা হলাম এমন এক প্রজাতি যারা জীবন ধারণ করে ধারাবাহিক আত্ম-তর্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত-গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অনেক সময় আমরা বেশি আবেগে আক্রান্ত হয়ে যা ঠিক ও ভুল বলে জানি তার মাঝের সীমারেখা মুছে ফেলি এবং

আমাদের আশ্রয় নিতে হয় ইচ্ছাশক্তিতে এবং আমাদের আত্মসংযমে তখন ইঙ্গিত করা হয়, না হলে আমরা ভুল পথে যাব এবং আমাদের ক্রিয়াকলাপের যাবতীয় প্রভাবের সম্মুখীন হব। পশুরা নিজের ভেতর এই ধারাবাহিক লড়াই থেকে মুক্ত, এবং এটা কোনো দোষের বিষয় নয় যে তাদের যা করার ইচ্ছে একমাত্র তাতেই শুধুমাত্র তারা সাড়া দেয়। ধর্মগ্রন্থ আমাদের বলে যে পরিরা শুধু কল্যাণই করত, কিন্তু এর কারণ হল তাদের অকল্যাণ করার ক্ষমতাই ছিল না। অন্যরা প্রোগ্রামিঙে সাড়া দেয়, আমরা পছন্দে সাড়া দিই। প্রকৃতপক্ষে এটাই মানবতার মহত্ত্ব। এটা ব্যাখ্যা করে কেন ঈশ্বর, ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, পরিদের আদেশ দিয়েছিলেন আদমের সামনে মাথা নোয়াতে, যদিও তারা পাপমুক্ত ও নিষ্কলুষ ছিল এবং আদম তা নয়, তবু তারা তাঁকে মান্য করেছিল।

এখানে আমরা একটু প্রসঙ্গান্তরে যাব এবং ব্রহ্মাণ্ড ও মানুষ নিয়ে আলোচনা

করব। যতই আমরা ব্রহ্মাণের অধ্যয়ন করছি তত বেশি করে আমরা উপলব্ধি করছি যে আমরা এমন একটি ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি যা এত বেশি সমতার ভারসাম্যে পূর্ণ যে সামান্য ভারসাম্য টলে গেলেই তা কসমিক ক্যাটাস্ট্রফে নিয়ে যাবে।

এখন আমরা তাকাই মানব সভ্যতার দিকে, যেসব মানুষ তার জীবনে পূর্ণমাত্রায় বাঁচতে চায়, যাকে আমরা বলি ভুল, অশুভ বা পাপ, তারা এটা আগাগোড়া উপভোগ করে, এবং অবশেষে তাদের মৃত্যু ঘটে। বিপরীতভাবে অন্যরা তাদের জীবনে সত্যের জন্য লড়াই করে, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে, তাদের নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকে এবং অবশেষে তাদেরও মৃত্যু ঘটে। এটাই কি সব? উভয় প্রকারের জীবনে মৃত্যুই কি শেষকথা? আমাদের অভ্যন্তরে কিছু একটা এটা গ্রহণ করতে নারাজ। তাহলে মানুষের দায়বদ্ধতা কোথায়? যদি মৃত্যুই হয় সব কাহিনির শেষ, তাহলে মানব জীবনের সঙ্গে গোটা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্য সূক্ষ্ম ভারসাম্যের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হত। সুতরাং এর একমাত্র উপসংহার হল মৃত্যু সবকিছুর সমাপ্তি হতে পারে না। শূন্য দ্বারা মৃত্যু অনুসরিত হতে পারে না, বরং হতে পারে আরেকটি জীবন দ্বারা যেখানে ভারসাম্য পুনঃসঞ্চিত এবং দায়বদ্ধতা পরিপূর্ণ। ঠিক এখান থেকেই

ধর্ম বলে, যখন মানুষের বিচার করেছিলেন ঈশ্বর, পরম বিচারক, ডে অব জাজমেন্ট-এ।

ঈশ্বর আমাদের স্ব-অধীনতা দিয়েছেন এবং আমাদের ধরে রেখেছন দায়বদ্ধতায়। আমরা নিখুঁত সৃষ্টি নই এবং আমরা তা হতেও চাইনি। আমাদের দরকার সংকট ও উত্তেজনার মুখোমুখি হয়েও আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং অনেক সময় আমাদের 'শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা'ও নিখুঁত হয় না। আমরা লড়াই করি এবং আমাদের জীবন হল অবিরত সংগ্রাম। এটা যৌক্তিক, সুতরাং, ঈশ্বর আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেন, আমাদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেন এবং আমাদের ভালোবাসেন তাঁর মহানতম সৃষ্টি রূপে। তিনি অবশ্যই আমাদের দেখতে ভালোবাসেন যে আমরা দায়বদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, আমাদের পছন্দের স্বাধীনতা সত্ত্বেও। এটা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল আমাদের সর্বদা স্মরণ করা যে তিনিই হলেন পরম আশ্রয় এবং প্রভু, যা শুভ ও অশুভ সবই তিনি যেভাবে আমাদের কাছে এগুলি উপস্থাপন করেছেন এবং অপরিহার্য ডে অব জাজমেন্ট-এ, আমরা যখন এগুলির জন্য দায়বদ্ধ হব। তিনিই এগুলি করেছেন মানব পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নির্বাচন করার দ্বারা, তাঁর নিজস্ব পথে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন (উদাহরণ সরাসরি কথাবার্তা, লেখা, প্রেরণা অথবা কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে) এবং তাঁদের নির্ধারণ করেছেন তাঁর বার্তা

তাদের সহযাত্রী মানুষের মধ্যে প্রচার করতে, ঈশ্বরের আরাধনা করো এবং একমাত্র ঈশ্বরের, কল্যাণ করো এবং অকল্যাণ থেকে দূরে থাকো, এবং সবসময় মনে রাখবে তোমার দায়বদ্ধতা তাঁর কাছে বিচার হবে অপরিহার্য সেই ডে অব জাজমেন্ট-এ। এটাই পয়গম্বরতার ধারণা এবং ইতিহাসজুড়ে, মানবতা অনেক পয়গম্বর ও প্রচারক পেয়েছে। এই দীর্ঘ শৃঙ্খলে কিছু ঈশ্বরের নাম নেওয়া হয়েছে ধর্মগ্রন্থে, কিছু তিনি ধর্মগ্রন্থে দিয়েছেন, এবং অন্যদের তিনি দিয়েছেন কিছু নির্দিষ্ট অত্যাশ্চয ঘটানোর শক্তি। এই শৃঙ্খলায় শেষ তিন প্রধান পয়গম্বর হলেন ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের আব্রাহামিক মোনোথেইস্টিকের প্রধান ব্যক্তিত্ব। এই তিন ব্যক্তিত্বের আছে কুলপতি আব্রাহামের সব শিষ্য : মহম্মদ

ইসমাইলের পথ ধরে, এবং ইসাকের পথ ধরে মোজেস ও যিশু (ইসমাইল ও ইসাক হলেন আব্রাহামের দুই পুত্র)।

এখানে এটা অত্যন্ত উপযুক্ত, যদিও, এটা ইহুদিদের জন্য নির্দেশ করলে পয়গম্বরের শৃঙ্খলা থামে ইহুদি ধর্মের সঙ্গে। তাদের কাছে যিশু মসিহা নন, না তাঁর মা মেরি, সেই সতী নারী, যা তিনি দাবি করেছিলেন, তিনি ছিলেন। তারা এখনও মসিহার জন্য অপেক্ষা করছে এবং খ্রিস্টধর্মকে স্বর্গীয় ধর্ম হিসেবে মানতে নারাজ। খ্রিস্টানদের জন্য এই শৃঙ্খলা খ্রিস্টধর্মে শেষ হয়, যদিও তারা ইহুদি ধর্মকে একটি স্বর্গীয় ধর্ম বলে গণ্য করে (ইহুদিদের দিক থেকে পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া)। অন্যদিকে, মুসলমানরা ইহুদি ও খ্রিস্ট উভয় ধর্মকেই গণ্য করে স্বর্গীয় উন্মেষের ভিত্তি রূপে, এ সত্ত্বেও যে না খ্রিস্টান না ইহুদি – কেউই ইসলাম ধর্মকে সেরকম মনে করে না এবং তারা বিশ্বাস করে না যে মহম্মদ ছিলেন যথার্থ পয়গম্বর এবং ঈশ্বরের দূত। মুসা ও যিশুকে বিশ্বাস করা এবং তাঁদের সম্পর্কে যত লিপি আছে সবই বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের (যে ব্যক্তি ইসলামে বিশ্বাস রাখে) আস্থার একটি অংশ, এবং পয়গম্বরের পূর্বসূরির শৃঙ্খলায় বিশ্বাস রাখাও মুসলমানের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান বলে, মুসলমানরা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করে, কোরান বলে :

সেই একই ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তোমার জন্য যাকে তিনি নোয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যা তিনি তোমাতে প্রকাশ করেছেন এবং যা আমরা আব্রাহাম, মোজেস ও যিশুর সঙ্গে যুক্ত করেছি, যে তোমার উচিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ধরে রাখা এবং সেখানে তোমার ঐক্য ভাঙবে না। (42:13)

কোরান সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলে সেটা অ-মুসলমান পাঠকদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মুসলমানদের বিশ্বাস কোরান হল, স্বয়ং

ঈশ্বরের নথিবদ্ধ কথা, মৌখিক ও লিখিতভাবে, এবং ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েলের মাধ্যমে এটা বলা হয়েছিল পয়গম্বর মহম্মদকে।

এটা শেষ হওয়ার পর, বইটা হয়েছিল মোটামুটি নিউ টেস্টামেন্ট-এর মতো, কিন্তু এটা সবকিছুকে একবারে প্রকাশ করেনি। এটি ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে এবং সমস্যা ও ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছে এবং এর উন্মোচন সমাপ্ত হয়েছে তেইশ বছর ধরে।

যখনই পয়গম্বর কোরানের একটি অংশ পেয়েছেন এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন, তিনি উদ্ধৃতি চিহ্নের শুরু (“) এবং শেষ (”) ইঙ্গিত দিয়েছেন, কথার শুরুতেই “ঈশ্বর বলেন” এবং শেষে “ঈশ্বর সত্য বলেন”। এই নতুন ভাষ্য খুব দ্রুত মানুষের স্মৃতিতে থেকে গেল, এর পাশাপাশি তৎকালীন লভ্য লিখিত বিষয়ের ওপর লিখনও থাকল। যখন কোরান সমাপ্ত হল, মহম্মদ এর চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা করলেন (এমন নয় যে বর্ণানুক্রমিকভাবে, বরং স্বর্গীয় নির্দেশে), এবং এটা তখন থেকে সংরক্ষিত আছে এর মূল ভাষা ও রূপে, শব্দের পর শব্দ, অক্ষরের পর অক্ষর। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে, এক্ষেত্রে কোরান অনন্য। একবার অনূদিত হলে সেটা আর কোরান থাকে না, কারণ মানব দ্বারা যে কোনো অনুবাদই মনুষ্যকৃত এবং সেটা মৌলিক ঈশ্বরকথন নয়।

কোরানের ভাষা আরবি, যাকে বিবেচনা করা হয় অননুকরণীয় সাহিত্য-সম্পদ রূপে। পয়গম্বরের সময়ে এটা আরবিদের প্রত্যাহ্বান করেছিল একে অনুকরণ করতে, কিন্তু তারা পারেনি এবং এর দ্বারা সন্ত্রস্ত ছিল, যদিও তারা তাদের সাহিত্য শক্তিতে নিজেদের গর্বিত ভাবত। ইসলামের সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু শত্রু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে শুধুমাত্র কোরানের স্তবক শ্রবণ দ্বারা।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলাম ও অন্যরা

কোরান অনুযায়ী, প্রতিটি মানুষ কেবলমাত্র মানুষ হয়েছে বলেই সম্মানিত, জাতি-বর্ণ-ধর্ম বা অন্যকিছু আর বিবেচনায়ই আসে না। কোরান বলে, “আমরা আদমের সন্তান হিসেবে সম্মানিত, জমি ও সাগরে তাদের পরিবহণের ব্যবস্থা করেছি, এবং আমাদের সৃষ্টির একটি মহৎ অংশের ওপরে তাদের বিশেষ সুবিধা দিয়েছি” (17:70)।

ইসলাম মানবতার একত্বকে একটি পরিবার রূপে গুরুত্ব দেয় : “ও মানবজাতি, তোমার অভিভাবক প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমায় জন্ম দিয়েছেন একটি একক আত্ম থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন – এর থেকে – এর সঙ্গী, এবং তাদের থেকে তৈরি করেছেন ছড়ানো যমজ (বীজের মতো) অগুন্তি পুরুষ ও মহিলা” (4:1)। সব মানুষ সমানভাবে বহন করে প্রাথমিক মানব অধিকার, যার অন্তর্ভুক্ত কোনো দ্বিরুক্তি ছাড়াই স্বাধীনভাবে একজনের ধর্ম পছন্দের অধিকার, ইসলামের মধ্যে ‘অন্যদের’ জন্য পরিসর সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত। ইসলাম কোনো বিশেষ ধর্ম নয়, এবং কোনো মানবকেই, যাজক বা অন্য কেউ, ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমার ওপর সীমা আরোপ করতে অথবা তাঁর তরফে কথা বলতে পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারণের জন্য। পরম বিচারক হলেন ঈশ্বর স্বয়ং : “শেষপর্যন্ত তোমার ফিরে আসা আল্লাহর দিকে... তিনি তোমাকে সেইসব বিষয়ের সত্যিটা বলবেন যেখানে তুমি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলে” (6:164)।

দ্য পিওপল অব দ্য বুক (ইহুদি ও খ্রিস্টান)

গোটা মানবজাতির মধ্যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই মুসলমানদের নিকটতম এবং সম্মানিত শিরোনাম পিওপল অব দ্য বুক প্রদত্ত। মুসলমানদের মতো তারাও একক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং তাঁর থেকে ধর্মগ্রন্থ গ্রহীতা। তারা পয়গম্বরতার ধারায় বিশ্বাস রাখে, এবং আমাদের বহু ইহুদি ও খ্রিস্টান বন্ধু বিস্মিত হয়ে যায় যখন তারা জানতে পারে যে বিবলিক্যাল প্রফেটরা হলেন ইসলামিক প্রফেটই। এই তিনটি ধর্মই একটি সাধারণ নৈতিকতায় ভাগ করে নিয়েছে। কোরান বলে :

বলো : "আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং উন্মোচন আমাদের প্রদত্ত হয়েছে, উন্মোচন প্রদত্ত হয়েছে আব্রাহাম, ইসমাইল, ইসাক, জ্যাকব এবং ট্রাইবদের, এবং সেটা প্রদত্ত হয়েছে মোজেস ও যিশুকে, এবং সেটাই প্রদত্ত হয়েছে (সব) পয়গম্বরকে তাঁদের প্রভু থেকে : আমরা তাঁদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ করিনি, এবং তাঁর কাছে আমরা সবাই সমর্পণকারী।' (2:136)

ইসলাম-এর আক্ষরিক অর্থ হল "আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে সমর্পণ।"

ইসলাম মুসলমানকে অনুমোদন দিয়েছে পিওপল অব দ্য বুক প্রদত্ত খাদ্য খেতে (যদি না সেটা নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়, যেমন অ্যালকোহন বা শুয়োর) এবং বিনিময়ে নিজেদের খাদ্য তাদের নিবেদন করতে : "পিওপল অব দ্য বুক-এর খাদ্য তোমার কাছে পবিত্র এবং তোমার খাদ্যও তাদের কাছে পবিত্র" (5:5)। উপরন্তু, কোনো মুসলমান বিবাহ (সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং পবিত্র বন্ধন) করতে পারে কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান মহিলাকে : "তোমার কাছে

বিবাহ পবিত্র (শুধুমাত্র নয়)

চরিত্রবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশ্বাসী, কিন্তু চরিত্রবতী মহিলারা পিওপল অব দ্য বুক যেমন প্রকাশ করেছে তোমার সময়ের কাছে যখন তুমি তাঁদের প্রাপ্য সম্পত্তি ও আকাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধতা দিয়েছ, এবং কামুকতা নয়, তাদের গ্রহণ করেছ প্রেমিকা রূপে।" (5:5) এরকম পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য চাপ দেওয়া কোনো মুসলমান স্বামীর জন্য বেআইনি, কেননা তা কোরানের নির্দেশের পরিপন্থী, "ধর্মে কোনো বাধ্যতা থাকবে না।" (2:256) তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁকে ধর্ম পালন করতে দেওয়াটাই প্রকৃতার্থে ইসলামীয় কর্তব্য।

কোনো ইসলামিক দেশে, পিওপল অব দ্য বুক সম্পর্কে আইনি ধারণাটা হল 'তাদের আছে আমাদের অধিকার এবং আমাদের কর্তব্যে ঋণী।' তারা সামাজিক সুরক্ষা ও রাষ্ট্র দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধার জন্য সমানভাবে যোগ্য। মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছিল পিওপল অব দ্য বুক সম্পর্কে কোনো অন্ধ গোঁড়ামিপূর্ণ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদক্ষেপ না করতে, এবং পয়গম্বর মহম্মদ স্বয়ং বলেছেন, "যে পিওপল অব দ্য বুক থেকে একজন ব্যক্তিকেও আঘাত করে, সে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আঘাত করে।"

সত্য ঘটনা হল যে এর সূচনা থেকে ইসলামিক সমাজ ছিল বহুত্ববাদী সমাজ। যখন মহম্মদ আদিমতম ইসলামিক দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মদিনা যান, একটি চুক্তি হয়েছিল সব উপজাতির সঙ্গে, যার মধ্যে ছিল ইহুদিদের বিভিন্ন উপজাতিও যারা সেখানে বাস করত, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও কর্তব্য।

ইসলাম কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম নয়। এটা হল মানবজাতির (একজন 'আরব' অথবা 'প্রাচ্য'-এর একটি ধর্ম নয়, যেমন অনেকে একে সূচিত করে) প্রতি সর্বজনীন আহ্বান। যদিও এটা সব মানুষকে আহ্বান করে, পিওপল অব দ্য বুক সহ, কিন্তু তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়েছে কেননা তাদের শত্রু বা নাস্তিক কোনো অভিধায় শ্রেণিভুক্ত করতে পারেনি। সত্যি কথা হল যে 'নাস্তিক' পরিভাষার উৎস ইউরোপীয়, ক্রুসেডের সময় মুসলমানদের বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শুভবোধকে ইসলাম দ্বারা স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে সে যেখানেই থাকুক না কেন : "তাদের সবাই একইরকম নয় : পিওপল অব দ্য বুক-এর একটি অংশ যা অবস্থান করে (অধিকারের জন্য), তারা গোটা রাতব্যাপী ঈশ্বরের সংকেতের মহড়া দেয় এবং ভক্তিতে তারা নিজেদের অবনত করে" (3:113)। কোনো

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ঈশ্বরের দয়ার একচেটিয়া দাবি করতে পারে না, না পারে এ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করতে : "যারা বিশ্বাস করে (কোরানে) এবং যারা ইহুদিদের (ধর্মগ্রন্থ) অনুসরণ করে, এবং খ্রিস্টানদের এবং সাবিয়ানদের, এবং যারা ঈশ্বর ও শেষ দিন-এ বিশ্বাস রাখে, এবং নিরপেক্ষ কাজ করে, তাদের ঈশ্বরের থেকে তারা পুরস্কার পাবে, তাদের কোনো ভীতি থাকবে না, না থাকবে তাদের দুর্দশা" (2:62)।

মতবাদের ব্যবধান

ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে ইসলাম যে সাধারণত্ব বহন করে তা খুবই ব্যাপক, এবং পাশ্চাত্যের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ দ্বারা যে স্টিরিওটাইপ ধারণা করা হয় তার থেকে এর বাস্তবতা খুবই পৃথক। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের পরস্পরের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে প্রকৃতপক্ষে তার তুলনায় উভয় ধর্মের নিকটতর ইসলাম ধর্ম, যেহেতু উভয় ধর্মের বিশ্বাসের ভিত্তি হল স্বর্গীয় প্রকাশ, যদিও ইহুদিরা না খ্রিস্টধর্ম না ইসলাম কোনো ধর্মকেই খুব বেশি স্বীকৃতি দেয় না। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে 'জুডিও-খ্রিস্টান' পরিভাষা ভুল প্রয়োগ হয়েছে, এবং আমার মতে একে নাম দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, ছিল একমাত্র একটিই উদ্দেশ্য, তা হল মুসলমানকে বাদ দেওয়া। আমাদের বর্তমান সভ্যতার আরও উপযুক্ত বিবরণ হতে পারে জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান-ইসলামিক, যাতে এই তিনটি ধর্মের শিকড় প্রোথিত রয়েছে আব্রাহামিক ঐতিহ্যে এবং ইসলামিক যুগের সভ্যতা বর্তমান সভ্যতার ভিত সজ্জিত করেছে। এটা ছিল একটি সভ্যতা

যেখানে মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যরা একত্রে বসবাস করত সুরক্ষা ও ন্যায্যতায় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের অধীনে।

সাধারণত যত ব্যাপকই হোক না কেন, মতবাদের ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন হওয়া সুবিধেজনক যা ছিল আব্রাহামিক বিশ্বাসের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইসলামের। একটি সাধারণ রূপরেখা দেওয়া হবে যাতে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের আক্রমণ বা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টান পাঠকদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে এটা বলা দরকার, যাতে তারা অজ্ঞানতা ও ভুল বোঝাবুঝির ফলে একে দোষারোপ না করে, যা নিহিত রয়েছে বর্তমান বিদ্বেষ এবং অশুভ ইচ্ছের ভেতর।

এসব ব্যবধানের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মুসলমানরা কীভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে এবং তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর হলেন শাশ্বত, অনন্ত এবং তাঁর সবকিছুতেই পরম। তাঁর জন্য একটি রূপ চিত্রিত করা

বা তাঁকে এমনভাবে বর্ণনা করা যাতে তাঁকে চিত্রার্পিত করা যায় সীমিতভাবে কিংবা তিনি যেমন অনন্ত তার চেয়ে নিম্নমানে প্রকাশ করা এসবই আমাদের কল্পনার ঊর্ধ্বে। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে যখনই কোনো কথা বলা হয় তার ভাষা হল সবচেয়ে পবিত্র। সেজন্য মুসলমান মননে এটা পাঠ করা অসম্ভব (বাইবেলে আছে) যে ঈশ্বর কোনো বাগানে বা বাগিচায় হেঁটেছেন অথবা তিনি পরিদের জড়ো করে বলেছেন আদম সম্পর্কে তাঁদের বলেছেন 'ধৈর্য রাখো, ওই মানুষটা আমাদের মতোই একজন হয়ে উঠবে,' অথবা তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুশোচনা করে বলেছেন (বন্যার পর), 'ইস্ এটা যদি আমি না করতাম,' অথবা ঈশ্বর ছয়দিন কাজ করেছেন এবং তারপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন অথবা কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রায় তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিল।

আরেকটা বিষয় সম্পর্কে বলতে হয়, পয়গম্বর ও ধর্মপ্রচারকরা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে এঁদের ঈশ্বর নিজ হাতে পছন্দ করেছেন, উভয়েই তাঁর বার্তা প্রচার করবেন এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের রোল মডেল হয়ে উঠবেন। যখনই

সমাজ মূর্তি উপাসনায় ফিরে যায় কিংবা ঈশ্বরের সহযোগী সঙ্গীদের সঙ্গে জড়িত হয় অথবা তাঁর দ্বারা নির্দেশিত নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হয়, পয়গম্বর ও ধর্মপ্রচারকদের পাঠান বিষয়টাকে সংশোধন করতে। যদি মানুষের নিখুঁতত্ব চিরস্থায়ী হত, তাহলে তারা হত এর শীর্ষ এবং মূর্ত প্রতিমূর্তি। ঈশ্বরের পয়গম্বররা তাঁর আইন গুরুতরভাবে ভঙ্গ করেছেন, যেমন তাঁদের প্রতারণা ও পাপ (যেমন জ্যাকবের ভাইয়ের সঙ্গে প্রতারণা এবং মদ্যপান করে তঁর বোনের সঙ্গে যৌনাচারের কাহিনি) বিধৃত আছে বিবলিক্যাল পোর্ট্রেটে, যা ইসলামিক শিক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা এর থেকে কেবলমাত্র একটিই উপংসহারে পৌঁছতে পারে যে পয়গম্বরদের এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে ধর্মগ্রন্থে মানুষের প্রক্ষিপ্ত ধারণা সন্নিবেশ করার ফলে।

ইহুদিরা

ইহুদিদের কাছে মুসলিমরা কখনো গণ্য হত তাদের তুতোভাই হিসেবে, কেননা আব্রাহাম ছিলেন মহম্মদের একই ঠাকুর্দা ইসমায়েলের পথ ধরে এবং ইজরাইলের (জ্যাকব) এবং তাঁর সন্তানদের ইসাকের পথ ধরে। এটা সুপরিচিত তথ্য যে, সারার সঙ্গে আব্রাহামের বিবাহ ছিল বন্ধ্যা যতদিন না সারার বয়স বেড়েছিল। সারার পুত্র ইসাকের জন্মের আগে, আব্রাহাম বিয়ে করেছিলেলন হাগারকে, যিনি গর্ভবতী হন এবং ইসমাইলের জন্ম দেন। কোরান অনুযায়ী, আব্রাহামের জন্য একটি পরীক্ষা রূপে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূরণ করতে, আব্রাহামকে ঈশ্বর আদেশ দেন তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে গ্রহণ করতে, সেই স্থানটিই কয়েক শতাব্দী পর মক্কা শহর রূপে গড়ে ওঠে, যেখানে পয়গম্বর মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ক্রুদ্ধ হাগার তাঁর পুত্রের জন্য জল খুঁজছিলেন এবং মাটির অপ্রত্যাশিত

বিস্ফারের ফলে জম-জম কুয়ো, যা প্রতিবছর মুসলমানরা হজের (তীর্থক্ষেত্র) সময় স্মরণ করে, এবং যখন কাবা পরিদর্শন করতে যায়, প্রথম মসজিদ, নির্মিত হয়েছিল একক ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য, আব্রাহাম ও ইসমাইল দ্বারা। ঈশ্বরের চাইলেন যে সারাও, তাঁর মেনোপজ শুরু হওয়ার পরও, গর্ভবতী হবেন এবং ইসাকের জন্ম দেবেন, ইসাক হলেন জ্যাকবের পিতা, যাঁর নাম পরে বদলে গিয়ে হয়েছিল ইজরাইল, ইজরাইলের বারো সন্তানের পিতা।

মুসলমানরা অবশ্য এনিয়ে কিছুটা আতঙ্কিত যে ইহুদি ও খ্রিস্টান্দের বড় অংশই ইসমাইলকে আব্রাহামের বৈধ সন্তান বলে বিবেচনা করে না, কেননা বিবলিক্যাল সংস্করণ হাগারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে আব্রাহামের স্ত্রীর পাশাপাশি সারার পরিচারিকা রূপে (জেনেসিস 16:3)। আমার কিং জেমস ভার্সন-এর (স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিং জেমস ভার্সন, গ্রেট ব্রিটেন : কলিন্স ওয়ার্ল্ড, 1975) কপিতে ইসমাইলের নাম গ্লসারিতেও নেই, এবং আমি সক্ষম হয়েছিলাম তাঁর কাহিনি উন্মোচন করতে একমাত্র আব্রাহামকে আমার চাবি হিসেবে ব্যবহার করে। বেশ কয়েকবার জেনেসিস (16:16, 17:23, 25, 26, 21:11) ইসমাইলকে

উল্লেখ করেছে 'তাঁর (আব্রাহামের) পুত্র' রূপে, সেজন্য এই পুত্রত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। এ ছাড়া, ইজরাইলের সন্তানদের মাতৃকুলের খোঁজ করতে, জেনেসিস আমাদের বলে যে ইজরাইল তাঁর দুই তুতোবোনের সঙ্গে বিয়ে করেছিল, র্যাচেল ও লিয়াহ, এবং তাদের দুই পরিচারিকার, জিলপা ও বিলহা, সঙ্গে, এবং এই চার স্ত্রীর বারো সন্তান ইজরাইলের। এখন পর্যন্ত কেউ এ দাবি করেনি যে ইজরাইলের কোনো সন্তানের সন্তানত্ব কম কেননা সে দাসীর পুত্র! তাহলে কি ইসমায়েলের বিরুদ্ধে দুইরকম বিচার হয়েছে? জেনেসিস 22:2 এপ্রসঙ্গে জানায় যে আব্রাহামকে ঈশ্বর বলেছিলেন, "হে পুত্র এটা গ্রহণ করো, একমাত্র পুত্র ইসাককে, যে সবচেয়ে প্রিয়, এবং নিয়ে যাও মোরিয়ার ভূমিতে, তাকে সেখানে নিবেদন করে একটি পাহাড়ের ওপর যা আমি বলব," মুসলমানদের বিশ্বাস যে উল্লেখিত

ইসাকের নাম জোর করে ঢোকানো হয়েছে, ইসাক কখনো আব্রাহামের একমাত্র সন্তান ছিল না (জেনেসিস 17:24-26) অনুযায়ী, ইসমাইলের চেয়ে তেরো বছরের ছোট, এবং উভয় পুত্রই জীবিত ছিল যখন তাদের পিতার মৃত্যু হয়।

আব্রাহামের এই পরীক্ষা, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সমর্পণ এবং তাঁর একমাত্র পুত্রকে (ইসমাইল) নিবেদন করার ইচ্ছে প্রতি বছর মুসলমানরা স্মরণ করে হজের (তীর্থক্ষেত্র) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। যদিও মুসলমানদের কাছে, ইসমাইল ও ইসাক উভয়ে সমানভাবে আশীর্বাদপুষ্ট এবং ভালোবাসার পয়গম্বর।

কোরান অন্তত পঞ্চাশ বার ইহুদিদের বা ইজরাইলের সন্তানদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে এইসঙ্গে রয়েছে 137 বার মুসার নামোল্লেখ ও আঠারোবার তোরার নাম। তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসার প্রতি রয়েছে পর্যাপ্ত দোষারোপ ও তীব্র তিরস্কার। উদাহরণস্বরূপ :

হে ইজরাইলের সন্তানরা, তোমার আমরা নিয়ামতকে স্মরণ করো, যে নিয়ামত আমি তোমাদের দিয়েছি এবং আমি তোমাদের বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর তোমরা সেই দিনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করো, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না (বাইরে থেকে)। আর স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের ফারাওদের থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন কাজ দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদের জবাই করত এবং তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখথ। আর এটা ছিল তোমাদের প্রভুর থেকে ভয়ংকর কঠিন পরীক্ষা। এবং মনে রেখো, তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদের রক্ষা করেছিলাম এবং ফারাওর দলকে তোমাদের দৃষ্টির সামনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আর যখন আমি মুসাকে চল্লিশ রাতের জন্য

নিযুক্ত করেছিলাম, আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ভয়ংকর ভুল করেছিলে। যদিও আমরা তখন তোমাদের ক্ষমা করেছিলাম, তবু তোমাদের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার একটা সুযোগ ছিল। (2:47-52)

আমরা ইজরাইলের সন্তানদের উত্তম আবাস দিয়েছিলাম এবং তাদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলাম। অতঃপর তারা মতবিরোধ করেনি, যতক্ষণ না তারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হল। নিশ্চয় ঈশ্বর কেয়ামতের দিন সেই বিষয়ে ফয়সালা করবেন যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করত। (10:93)

এটা উল্লেখ করা দরকার যে যখই কোরান ইহুদিদের তিরস্কার করেছে, প্রকৃতপক্ষে তার কারণ হল তারা এমনকিছু করেছে যে তাদের ধর্মের সঙ্গে কোরানের মতবিরোধ ঘটেছে (বাইবেলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে, ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা করার জন্য দায়ী করেছে ইহুদিদের [উদাহরণস্বরূপ দেখুন 2 রাজা 17:7-23])। যদিও কোরান কখনো ইহুদিদের মানুষ হিসেবে খাটো করেনি, না করেছে অবনত অথবা কোনো আদি সমাজ বা জাতির নিন্দা করেনি। প্রকৃতপক্ষে কোরান এই বিষয়ে পর্যাপ্ত বিবেচনা করেছে যে বহুদিন ধরে ইহুদিরা এমন এক পৃথিবীর একমাত্র মশালবাহকের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে যে পৃথিবী ছিল মূর্তিপূজক বা প্রতিমা উপাসক। যদিও খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলামের আবির্ভাবের পর ইহুদিদের মোনোথেইজমের একচেটিয়া অধিকারের দাবি বাস্তবতা হারায় এবং এর ধারণায় যে জাতিকে তারা আঁকড়ে ধরে সেটাই আজ পর্যন্ত টিকে আছে। অন্তত পক্ষে এটাই খ্রিস্টান ও মুসলমানরা অনুভব করে।

ইসলাম কোনো জাতিকে বাছাই করার ধারণা সমর্থন করে না। কোরানে আল্লাহ বলেছেন :

হে মানবজাতি : আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরের (পরস্পরকে বঞ্চিত করে নয়) পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানযোগ্য আল্লাহর দৃষ্টিতে, যা তিনি সম্যক অবহিত। (49:13)

মানুষ ভালো বা খারাপ হতে পারে একমাত্র ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে, কোনো বিশেষ বংশে জন্মানোর ভাগ্যের ফলে নয়। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে আব্রাহামকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কোরান সংস্করণে :

আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা

করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম (নেতা) বানাব।' সে বলল, 'আমার বংশধরদের থেকেও!' তিনি (আল্লাহ) উত্তর দিলেন, 'কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি শয়তানদের স্পর্শ থেকে দূরে থাকে।' (2:124)

আজকে আরব ও ইহুদিদের মাঝে সংঘর্ষের মূল রয়েছে আব্রাহামকে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিদার বিবলিক্যাল সংস্করণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে : 'এবং আমি এটা দেব, এবং এর ওপর বীজ বপন করব, যে ভূমি হবে জাহান্নাম, যা হবে কাফেরদের জন্য কয়েদখানা।' (জেনেসিস 17:8) প্যালেস্তিনীয় সমস্যার জটিলতা উদ্ভূত হয়েছে ইহুদিদের এই বিশ্বাস থেকে যে 'আব্রাহামের বীজ'-এ শুধু ইহুদিরাই অন্তর্ভুক্ত। সেই অনুযায়ী, সমকালীন ইহুদিদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে এই ভূমিতে একমাত্র ইহুদিদেরই বাস করার অধিকার আছে, যে ভূমি, একশো বছরও হয়নি, অধ্যুষিত ছিল মুসলমান ও প্যালেস্তিনীয় খ্রিস্টান, যারা শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করত খুব কমসংখ্যক ইহুদি সংখ্যালঘুদের সঙ্গে। পরে ওই প্যালেস্তিনীয়দের অধিকাংশকে প্রকৃতপক্ষে তাদের ঘর ও জমি ছাড়তে বাধ্য করেছিল জিওনিস্টরা যারা ইজরায়েলের (একটি চলন্ত জীবনীর জন্য দেখুন ইলিয়াস চাকোরের ব্লাড ব্রাদার্স (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস : চোজেন বুকস্, 1984) সমপর্যায়ের দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ ছাড়া, ইজরায়েলের সন্তানরা যারা খ্রিস্টান বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা আপনাআপনি বাদ পড়ল বর্তমান

ইজরায়েলি 'প্রত্যাগমনের আইন' থেকে। যদিও তারা ইজরাইলের (অর্থাৎ পয়গম্বর জ্যাকব, ইসাকের পুত্র, আব্রাহামের পুত্র, অথবা আব্রাহামের প্রথম পুত্র ইসমাইল) বৈধ বংশধর। না তারা না প্যালেস্তিনীয় মুসলমান ও খ্রিস্টানরা নিজেদের বহিরাগত রূপে দেখত, যারা নিজের ভূমি ছাড়তে বাধ্য হত কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকতে বাধ্য হত, সেই ভূমিতে যেখানে তাদের পূর্বপুরুষরা সহস্রাব্দ ধরে বাস করেছেন। তারা কিছুতেই গোল্ডা মেয়ারের বিবৃতি লুকোতে পারত না, 'প্যালেস্তিনীয়দের মতো এরকম আর কোনো বিষয় নেই, তাদের অস্তিত্বই নেই।' (সানডে টাইমস (লন্ডন), 15 জুন, 1979, আর গারাউডি-র 'দ্য কেস অব ইজরায়েল' (লন্ডন : শোরোক ইন্টারন্যাশনাল, 1983) 37 থেকে উদ্ধৃত), অথবা জিউইশ ন্যাশনাল ফান্ড-এর প্রাক্তন প্রধান যোসেফ ওয়েইটজের মন্তব্য, 'আমাদের মাঝে এটা স্বচ্ছ হওয়া উচিত যে এই দেশে উভয় জনগণের একত্রে থাকার কোনো জায়গা নেই।' (ডাভর (ইজরায়েল), 29 সেপ্টেম্বর, 1967)

প্যালেস্তিনীয় সমস্যাকে মুসলমানরা দুটি ধর্মের মাঝে সংঘাত রূপে দেখত না, বরং দুই গোষ্ঠীর মানুষের মাঝে সংঘাত হিসেবে দেখত যাদের পৃথক

বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের বিধান অনুযায়ী এর প্রস্তাবে দরকার হল শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টা। একটি সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ সমাধান সেটাই যা ন্যায় ও স্বচ্ছতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেটাই স্থায়িত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা। শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে বোঝাপড়া ভিত্তিক ফলাফলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিস্তর ফারাক। বোঝাপড়ায় কোনো ভার্সাই মানসিকতার প্রভাব থাকা উচিত নয়, কিন্তু এটা উপলব্ধি করতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর এই অংশের বিষমধর্মী নয়, হওয়া উচিত সমধর্মী, তিনটি আব্রাহামিক বিশ্বাসের জন্য স্থানটিতে সহিষ্ণুতা ও শুভবোধ থাকা উচিত যা তাদের বৈচিত্র্যময়তাকে ঐক্যের মাধ্যমে উদযাপন করবে। সাধারণ বুদ্ধি ও ধর্ম উভয়েই যায়

সেই অভিমুখে, যদি সব পক্ষ ঈশ্বরের বাণী শুনতে তাদের চোখ ও হৃদয় খোলা রাখে।

ঐতিহাসিকভাবে ইহুদি ও মুসলমানদের সম্পর্কের মাঝে উত্থানপতন ঘটেছে, কিন্তু কখনো সেটা ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাসকে ইসলাম আঘাত দিয়েছে বলে হয়নি। সংঘর্ষ হয়েছে পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং সেগুলি হয়েছিল যৌক্তিক কারণের ভিত্তিতে। যদিও এটা আমরা কিছুতেই দাবি করতে পারি না যে মুসলমানদের ইতিহাস সবসময় ইসলামের শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছে। নির্দিষ্ট করে স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের প্রতি অবিচার ভাগ করে নিয়েছিল, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের বাদ দেওয়ার বিষয় ছিল না, যারা সর্বদাই প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয়েছিল। ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপে নৈরাজ্যের ফেল ইহুদিদের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অত্যাচার হয়েছিল, এর মধ্যে এই শতকের হলোকাস্টও রয়েছে, কিন্তু মুসলমান বিশ্বে ইহুদিদের কখনো সেই পীড়ন সহ্য করতে হয়নি। ক্রাইস্টেনডোম-এ ইহুদিদের তকমা লাগানো হয়েছিল ঈশ্বরের হত্যাকারী রূপে, এবং এজন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছে একটির পর একটি হত্যা-লুণ্ঠনের ঘটনায়। এমনকি শত্রু যখন ছিল মুসলমান, ইউরোপ সর্বদা ইহুদিদের মৃত্যুকে 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' রূপে আখ্যা দিয়েছে। ইউরোপে হাজার হাজার ইহুদি হত্যার মধ্য দিয়ে প্রথম 'ক্রুসেড' শুরু হয় এই অনৈতিক ও ক্ষতিকর যুক্তির মাধ্যমে : 'ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে পূর্বদিকে আমাদের বহুদূর যাত্রা করতে হবে, এবং আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তাঁর সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রুর দিকে – ইহুদিরা। প্রথমেই ওদের নিকেশ করতে হবে।' (কন, নর্মান। দ্য পারসুইট অব দ্য মিলেনিয়াম। ব্যাম্বার গাসকোয়েন, দ্য ক্রিশ্চিয়ানস (লন্ডন : জোনাথন কেপ, 1977), 113)

1492 সালে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার জয়ের ফলে স্পেন থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন করা হয়েছিল। পূর্বের প্রতিশ্রুতির বিপরীত, মুসলমান বা ইহুদিদের নিজেদের ধর্ম অনুশীলনকে করা হয়েছিল বেআইনি, তারা যদি ক্যাথলিজমে ধর্মান্তরিত না হত তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত

কিংবা দেশ থেকে বিতাড়ন করা হত। বহু ইহুদি চলে গিয়েছিল তুরস্কে, তখন সেখানে ছিল ইসলামিক ক্যালিফেটের শাসন, এবং তাদের সম্মানজনকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার ইহুদি বিতাড়ন নীতিকে ব্যঙ্গ করে সুলতান বলতেন, 'ওঁরা নিজেদের রাজত্বের ক্ষতি করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।' স্পেনে মুসলমান যুগ চলাকালীন সভ্যতায় ইহুদিদের অবদান খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ বোধহয় মহান মাইমোনাইডস, যিনি ছিলেন করডোভার ইসলামিক দার্শনিক ইবন রুশদ-এর (অ্যাভোরোজ) ছাত্র, যিনি পরে ইজিপ্টে গিয়ে হয়েছিলেন সালাউদ্দিনের (ক্রুসেড খ্যাত সালাউদ্দিন) ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

ইজরায়েলি পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং প্রাক্তন বিদেশ সচিব আব্বা ইবান (ইবান, আব্বা, মাই পিওপল, নিউইয়র্ক, বেহরমান, 1968) তাঁর বই মাই পিওপল-এ বলেছেন যে ইহুদিদের সঠিক ন্যায় পাওয়ার ইতিহাসে দুটি এপিসোড আছে, একটি হল স্পেনে মুসলিম শাসনে আর দ্বিতীয় হল বর্তমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইসলামিক দেশগুলিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহুদিরা নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেছে। এমনকি আজও বহু ইসলামিক দেশে ভালোসংখ্যক ইহুদি সম্প্রদায় বাস করে যারা, প্যালেস্তিনীয় সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, মুসলমান ও খ্রিস্টান প্রতিবেশীর চেয়ে কোনো অংশে কম সুবিধা ভোগ করে না।

খ্রিস্টান

"আর স্মরণ করো এই বইতে মেরির (কাহিনি), যখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গের থেকে পৃথক পূর্বদিকের কোনো এক স্থানে চলে গেল। এবং তিনি নিজেকে তাদের থেকে পর্দা দিয়ে আড়াল করলেন :

তারপর আমরা তাঁর কাছে আমাদের ফেরেশতাকে প্রেরণ করলাম। তিনি তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল। তিনি বললেন : 'আমি তোমার থেকে পরম করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো।' সে বলল, 'না, আমি তো শুধু তোমার প্রভুর বার্তাবাহক, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্রসন্তান উপহার দিতে এসেছি।' মেরি বললেন, 'আমার কী করে পুত্রসন্তান হবে যেখানে আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই?' সে বলল, 'এভাবেই (হবে), তোমার প্রভু বলেছেন, "এটা আমার জন্য সহজ : এবং (আমরা শুভেচ্ছা জানাই) তাঁকে নিযুক্ত করতে চাই মানুষের জন্য একটি নিদর্শন রূপে এবং আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা হিসেবে।" এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়।'

তারপর তিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন দূরবর্তী একটি প্রত্যন্ত স্থানে। অতঃপর প্রসব বেদনা তাঁকে নিয়ে এল একটি খেজুর গাছের শাখার নীচে। তিনি কাঁদলেন (ক্রোধে), 'হায়! আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম... তখন আমি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতাম।' কিন্তু একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে ডাকল নীচ (খেজুর গাছের) থেকে : উদ্বিগ্ন হয়ো না! তোমার প্রভু তোমার জন্য একটি ঝর্না সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নীচের দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার ওপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে। অতঃপর তুমি খাও, পান করো এবং চোখ জুড়োও। আর যদি তুমি কোনো মানবকে (ব্যক্তি) দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি, অতএব আজ কোনো মানুষের সঙ্গে আমি আজ কিছুতেই কথা বলব না।'

এরপর তিনি তাঁর শিশুকে কোলে নিয়ে তাঁর স্বজনের কাছে এলেন এবং তাঁরা বলল, 'ওহ মেরি! তুমি সত্যিই একটা দুর্দান্ত ব্যাপার ঘটিয়েছ। হে হারুনের বোন, তোমার পিতা খারাপ মানুষ ছিলেন না, না তোমার মা ছিলেন ব্যাভিচারিণী।' তিনি (শিশুটি) বলল : 'আমি প্রকৃতার্থেই

আল্লাহর (ঈশ্বর) সেবক। তিনি আমাকে দৈবজ্ঞান দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন যে যেখানেই আমি থাকি না কেন যতদিন আমি বাঁচব প্রার্থনা করতে ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহংকারী, অবাধ্য করেননি। আর আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হয়েছে যেদিন আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় ওঠানো হবে (আবার)।" (19:16-33)

কোরানে যিশুর এরকম একটি উদ্ধৃতিতে কাহিনি আছে। কোরানে তাঁকে 'যিশু' বলা হয়েছে পঁচিশবার, এগারোবার 'মসিহা' এবং 'মেরির সন্তান' বলা হয়েছে মাত্র দুবার। মেরির নাম উদ্ধৃত হয়েছে চৌত্রিশবার এবং 'তিনি যিনি তাঁর সতীত্বকে রক্ষা করেছেন' বলা হয়েছে দুবার। মুসলমানরা হতবাক ও মূক হয়ে যায় তারা যখন তারা পড়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞদের লেখা এবং সবচেয়ে যন্ত্রণাকর, যাজকরা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাখ্যা করেছেন যিশুর শত্রুরূপে। উলটোদিকে, বহু খ্রিস্টান, যাঁরা ভুল তথ্য পেয়েছেন বা তথ্য পাননি, অবাক হয়ে যায় যখন আমরা তাদের বলি যিশু ও মেরির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা, যদিও আমাদের ধর্মীয় মতবাদের পার্থক্য আছে। ইসলামে যিশু ও মেরির প্রতি কী উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় তা প্রকাশ করতে কয়েকটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

স্মরণ করো! পরিরা বলল, 'ও মেরি : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে ইসা, মেরির পুত্র, এই দুনিয়ায় সম্মানপ্রাপ্ত এবং এরপরও।' (3:45)

মেরির পুত্র মসিহা ঈসা, শুধুমাত্র আল্লাহর রসুল এবং তাঁর কালিমা যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মেরির প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে শুভবোধ। (4:171)

আর স্মরণ করো সে নারীর কথা, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমাদের 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য করেছিলাম একটি নিদর্শন। (21:91)

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাঝে একটি প্রধান এবং আবশ্যিক ব্যবধান আছে যিশুর প্রতি তাদের অবস্থান নিয়ে, মুসলিমরা যিশু বা ঈসাকে মনে করেন ইহুদিদের

জন্য ইশ্বরের সত্যিকারের এবং বিশুদ্ধ বার্তাবাহক। কোরান বলে, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মেরির পুত্র ঈসা তাঁর অনুগামীদের বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? অনুগামীরা বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর ইজরাইলের সন্তানদের মধ্যে একদল ঈমান আনল এবং অপর এক দল প্রত্যাখ্যান করল।" (61:14)

যারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার মাকে ব্যাভিচারিণী বলে অভিযুক্ত করেছে কোরান তাদের বারবার তিরস্কার করেছে : "...তারা মেরির বিরুদ্ধে মারাত্মক অপবাদ দিয়েছিল, তারা বলেছিল (চিৎকার করে) "আমরা মসিহা ঈসাকে মেরেছি, যে মেরির পুত্র, ঈশ্বরের দূত।'... কিন্তু তারা তাঁকে মারেনি, তাঁকে শূলেও চড়ায়নি... বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি।" (4:156-158)। সুতরাং ইসলাম খ্রিস্টের রক্ত থেকে ইহুদিদের সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছে। খ্রিস্টানদের একাংশের এই ধারণায় বিশ্বাস আছে যে যিশু নয় (বোধহয় জুডাস এসক্যারিয়ট), আরেকজনকে গ্রেফতার করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। খ্রিস্টকে গ্রহণ না-করার জন্য ইহুদিদের তিরস্কার করে কোরান বলে :

আমরা মুসাকে বই দিয়েছি এবং তারপর একের পর এক রসুল প্রেরণ করেছি আর মেরির পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ।

আর তাকে শক্তিশালী করেছি 'পবিত্র আত্মা'র মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখই কোনো রসুল এমন কিছু নিয়ে এসেছেন, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহংকার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। (2:87)

মুসলমানরা অত্যাশ্চর্য ঘটনায় বিশ্বাস করে যা ঈশ্বরের পরিত্যাগ দ্বারা করেছিলেন যিশু, কোরানে যার উল্লেখ রয়েছে :

যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মেরির পুত্র ঈসা, তোমার ওপর ও তোমার মাতার ওপর আমার নিয়ামত স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে, তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল*, আর যখন আমার আদেশে কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মতো গঠন করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, ফেলতে আমার আদেশে তা পাখি হয়ে যেত। আর তুমি আমার জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে এবং যখন আমার

আদেশে তুমি মৃতকে জীবিত বের করতে। আর যখন তুমি স্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে এসেছিলে তখন আমি ইজরাইলের সন্তানদের তোমার থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল এটা তো স্পষ্ট জাদু।' (5:110)

(* ইনজীল : মূল বইটি এতদ্বারা প্রফেট যিশুকে (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) উন্মোচিত করেছে, যা আর লভ্য নয়, যদিও এর অংশগুলি জীবিত রয়েছে গসপেলে (অথবা নিউ টেস্টামেন্টে)। সম্পাদিত)

প্রাক্-খ্রিস্টান ও পয়গম্বর মহম্মদ উভয়ের সময় থেকে যিশুর আন্তরিক অনুগামীদেরও ঘিরে রাখতে প্রশংসা বিস্তৃতর হয়েছে :

অতঃপর তাদের (নোয়া, আব্রাহাম ও তাদের গোষ্ঠীর অন্যান্য পয়গম্বররা) আমরা আমাদের

রসুলদের অনুগামী করেছিলাম এবং মেরির পুত্র ঈসাকেও অনুগামী করেছিলাম। আর তাকে ইনজীল কিতাব দিয়েছিলাম এবং যারা তাকে অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে করুণা ও দয়ামায়া দিয়েছিলাম। (57:27)

এবং মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদের (মানুষের মধ্যে) নিকটতম পাবে তাদেরকে, যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান, তা এই কারণে যে তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে এবং তারা নিশ্চয়ই অহংকার করে না। (5:82)

আসুন আমরা এখন বিবেচনা করি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে কয়েকটি পার্থক্য। সবচেয়ে বড় বিষয়টি হল যে মুসলমানরা কুমারী মেরির সতীত্বে বিশ্বাস করে, বলে যে ঈশ্বর দ্বারা কোনো জনক ছাড়াই যিশু 'সৃষ্ট' হয়েছিলেন, যদিও কখনো বলে না ঈশ্বর দ্বারা 'জন্মগ্রহণ' করেছিলেন। তাদের কাছে এরকম জৈবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে ঈশ্বর, তিনি হলেন শাশ্বত এবং পরম, যেমন কোরানে বিধৃত : "বলো : তিনিই আল্লাহ (ঈশ্বর) একমেবাদ্বিতীয়ম, আল্লাহ, শাশ্বত, পরম : তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।" (112:1-4)। আক্ষরিকভাবে ঈশ্বরের সন্তান রূপে যিশুকে বিশ্বাস করাটা ইসলামিক বিশ্বাসের পরিপন্থী (যদিও এটা গ্রহণযোগ্য যে, সামগ্রিকভাবে আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান)।

আবার এই ধর্মবিশ্বাসও গ্রহণযোগ্য নয় যে মেরি হলেন ঈশ্বরের মাতা। মেরি ও যিশু দুজনকেই মানুষ রূপে ইসলামে খুবই সম্মান দেওয়া হয়েছে, এবং ঘটনা হল কোনো পিতা ছাড়া জন্মেছেন বলে যিশুকে, ইসলাম ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী,

'ঈশ্বরের ঔরসে একমাত্র সন্তান' বলা হয়নি। কোরান এবিষয়ে তুলনা টেনেছে এভাবে : "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'হও' : এবং সে হয়ে গেল।" (3:59)

কোরান অনুযায়ী, যিশু কখনো তাঁর নিজের বা তাঁর মায়ের জন্য স্বর্গীয় অস্তিত্বের দাবি করেননি :

এবং দাঁড়াও! আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মেরির পুত্র ঈসা, তুমি মানুষকে বলেছিলে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতা উভয়কে ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করো?' সে বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি সেটা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না, নিশ্চয় আপনি সমস্ত গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। আমি তাদের তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, "তোমরা আমার প্রভু, তোমাদের প্রভু, আল্লাহের প্রার্থনা করো।" আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সবকিছুর সাক্ষী। যদি আপনি তাদের শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারাই সেবক, আর তাদের যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (5:116-118)

মুসলমানরা সেজন্য নিউ টেস্টামেন্টের সেইসব লেখা দিয়ে চিহ্নিত করেছে যেহেতু এই বিবৃতি যিশুর প্রতি নিবেদিত : "তাহলে কেন আমাকে উত্তম বলছ? এখানে কেউ উত্তম নয়, একজন বাদে, তিনি হলেন ঈশ্বর" (মার্ক 10:18)

নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, যখন যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "ইলোই ইলোই, লামা সাবাচানি?" অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তারা আমাকে বিদ্ধ করছে?' (মার্ক 15:34) অবশ্যই তিনি নিজের সঙ্গে নয়, অন্য কারো সঙ্গে কথা বলিছেলন। ত্রিত্ব এবং একের ভেতরে তিন ঈশ্বরের গোটা ধারণার ইসলামে কোনো স্থান নেই : "বলো তিন নয় : বিরত হও, এটা তোমার জন্য ভালো হবে, আল্লাহই কেবল একক আল্লাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে তাঁর কোনো সন্তান হবে। আসমানে যা রয়েছে, জমিনে যা আছে তা সবই আল্লাহর। (4:171)। মুসলমানরা এই বিশ্বাস ধারণ করে না যে অনন্তকে ভাগ করা যায় তিনের মধ্যে অংশ হিসেবে ঢোকানো যায় অথবা হোলি স্পিরিটের জন্য ইসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

আমরা এই ধারণা পোষণ করি যে যিশু কখনো কোনোকিছু বলেননি

তিন স্বর্গীয় ব্যক্তির একটি 'একক ঈশ্বর'-এ অধিষ্ঠানের ব্যাপারে এবং তাঁর ঈশ্বরের ধারণা কখনো পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের থেকে পৃথক ছিল না, যাঁরা ঈশ্বরের ঐক্য (কখনো ত্রিত্ব নয়) প্রচার করেছিলেন। এ ছাড়া ত্রিত্বের ধারণা আদি খ্রিস্টানদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে, এটা রোমান শাসকের ধর্মবিশ্বাসে ঢুকেছিল 325 খ্রিস্টাব্দের নিকায়ে কংগ্রেসে এবং প্রযুক্ত হয়েছিল শাসকের সর্বশক্তি দ্বারা সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের অধীনে। নিউ ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া (নিউ ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া, এস.ভি. "দ্য হোলি ট্রিনিটি") বর্ণনা দেয় : "তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ঈশ্বর' গঠন খ্রিস্টানদের জীবনে এবং এদের বিশ্বাসের পেশায় গভীরভাবে প্রোথিত ছিল না চতুর্থ শতকের আগে।

পার্থক্যের ধারণার আরেকটি অঞ্চল হল মূল পাপের ধারণা। বাইবেল অনুযায়ী, নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ইভকে ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করেছিল শয়তান এবং সে তারপর এটা করার জন্য আদমকে প্ররোচনা জুগিয়েছিল, এইসূত্রে সে পাপ করেছিল। তারপর তাদের শাস্তি দেওয়া হয় পৃথিবী গ্রহে লজ্জার সঙ্গে বিতাড়ন করে, আরও দোষারোপ করে ইভকে প্রধান দোষী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় : "মহিলাদের প্রতি তাকিয়ে সে বলেছিল : আমি সেই দুঃখ ও সেই ধারণা বহু বৃদ্ধি করব, দুঃখে আরও শিশু এনে, এবং সেজন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে সেই স্বামীর এবং সে এসবের ওপর শাসন করবে" (জেনেসিস 3:16)। সাধারণ খ্রিস্টান শিক্ষা হল সব মানুষই সেই পাপ ধারণ করে এবং সেভাবে প্রতিটি সদ্যোজাতই জন্মায় পাপের মধ্যে।

এই ঘটনার কোরানিক সংস্করণ হল আদম ও ইভ উভয়কেই শয়তান প্ররোচনা দিয়েছিল, তারা দুজনেই পাপী, তারা দুজনেই অনুশোচনা করেছিল, তাদের দুজনকেই ক্ষমা করা হয়েছিল এবং সেটাই ছিল মূল পাপের সমাপ্তি : "অতঃপর শয়তান তাদের প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল (আগে)... এবং সে তাদের দুজনকে বলল,

'তোমাদের প্রভু তোমাদের কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা ফেরশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' আর সে তাদের নিকট শপথ নিল যে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন' (৭ : 20-21)। তাদের অনুশোচনার পর, "অতঃপর আদম তার প্রভুর থেকে কিছু কথা জানল এবং আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিলেন, তিনি নিশ্চিত দোষ মকুবকারী, অতি দয়ালু" (2:37)।

এরপর আদম পয়গম্বরের মর্যাদা পেল এবং মানবজাতি পৃথিবী গ্রহে কাজ করতে থাকল আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে। শয়তান শপথ নিল তাদের অনুসরণ করার এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করার, কিন্তু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের এমন পথ দেখাবেন যাতে তারা শয়তানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, একমাত্র তাদের ঈশ্বর কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি যারা স্বর্গীয় পরামর্শের দিকে পিছন ফিরে ছিল। সুতরাং বলা যায় যে প্রত্যেক মানব জন্মগ্রহণ করে অপাপবিদ্ধ অবস্থায়, এবং একমাত্র এরপর আমাদের পছন্দ আমাদের দোষী করে এবং করে তোলে পাপী। ইসলামের মতে, পাপ সেটা নয় যা শিশুরা তার মা-বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে।

এপ্রসঙ্গে, ইসলাম জোর দিয়েছে দায়বদ্ধতা ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় : "যে পরামর্শ গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই পরামর্শ গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোনো বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না" (17:15)। সেজন্য প্রতিনিধিত্বমূলক স্বার্থত্যাগের ধারণা ইসলামে অপরিচিত, এবং যিশু, বা অন্য কাউকে, মানুষের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল নিহত হয়ে, গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়া যায় আন্তরিক অনুশোচনায় এবং ন্যায়পরায়ণ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে, রক্ত ঝরানোর কোনো দরকার নেই। ঈশ্বরের করুণায় মোক্ষ লাভ অনুমোদিত : "আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজের প্রতি কোনো খারাপ কাজ করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের দোষের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া তাদের পাপ কে ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে জেনেশুনে তারা তা বারবার করে না" (3:135)।

ঈশ্বরের ক্ষমার জন্য কোনো পাপই বেশি মহৎ হতে পারে না। 'বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (৩৯:৫৩)। পয়গম্বর মহম্মদ অনুযায়ী আল্লাহ বলেন, "তোমরা আদমের সন্তান, তোমরা প্রচুর পাপ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে, তারপর তোমরা অনুশোচনা করেছিলে এবং আমার প্রার্থনা করেছ, আমার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক না রেখে এবং আমি পর্যাপ্ত ক্ষমা নিয়ে তোমাদের কাছে গেছি।"

যিশুর রক্ত দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ধারণা এবং একটি বাছাই জাতির ধারণা (ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সুবিধা উপভোগ করে) বাতিল হয়েছে। মুসলমানদের আল্লাহর ক্ষমার মহৎ আশা প্রকাশিত হয়েছে তারা নিজেরা ক্ষমাপ্রার্থী দ্বারা। ব্যক্তি, উপজাতি বা দেশের মাঝে ক্ষমার ভূমিকা হল ইসলামের মূল সুর। এমনকি যখন আগ্রাসী হয়ে আইন হস্তক্ষেপ করে কোনো শাস্তি প্রদানে, যে

পক্ষ ভুল করেছে তাদেরও ক্ষমা করতে প্রেরণা দেওয়া হয় : 'আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে' (42:40), 'আর তাদের ক্ষমা করতে দাও, তাদের যেতে দাও। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?' (24:22)

কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে, তার কোনো মধ্যস্থতাকারী বা ওকালতির দরকার পড়ে না, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে, তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে একটি সরাসরি যোগ রয়েছে : যখন তারা দয়া ও ক্ষমার জন্য কাতর অনুনয় করে। তিনি সাড়া দেন ও ক্ষমা করেন। স্বীকারোক্তির জন্য কোনো মানুষের কাছে যাওয়া এবং তারপর সব শুনে ওই ব্যক্তি হয়তো বলবে, 'তুমি যাও বৎস, তোমাকে ক্ষমা করা হবে', এরকম কোনো ব্যাপার ইসলামে স্থান পায় না। ক্ষমার অধিকার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর, এবং কোনো মানুষ কখনো তাঁর স্থানে তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এবং তথ্য হল ইসলামে যাজক সম্প্রদায়ের কোনো সংস্থা নেই। যদিও ঈশ্বরতত্ত্ব

বৃত্তি (থিয়োলজিক্যাল স্কলারশিপ) আছে, কিন্তু কোনো যাজক সম্প্রদায় নেই। এই আশায় যে আল্লাহর দয়ার সীমা নেই, এটা একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতায় (এবং তিনিই হলেন পরম ন্যায়পরায়ণ) অথবা তাঁর দয়ায় (এবং তিনিই হলেন পরম দয়ালু) আমাদের সাড়া দেওয়া, এবং আমরা গোটা জীবন ধরে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের তাঁর ন্যায়ের চেয়ে বেশি দয়া প্রদান করেন। আমাদের অনুশোচনা হওয়া উচিত আন্তরিক ও গভীর এবং এটি বাস করে হৃদয়ে, মানুষের ক্রিয়াকলাপে এর প্রকাশ ঘটা উচিত। এটা হবে চরম বৈপরীত্য যে কেউ আমার ওয়ালেট চুরি করল এবং সেটা ফেরত দিতে চাইল না এবং বারবার, এমনকি লক্ষবার, বলতে থাকল, 'ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো'। যখন কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকে, সেখানে প্রথমেই ন্যায্য বিচার করা উচিত।

এসব ধর্মীয় মতবাদের ব্যবধান মামুলি নয় বা না এগুলি উপেক্ষা করা যায়, এরপরও এটা খুব বোকামো হবে এসব নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই বা কাউকে ঘৃণা করা। বিশ্বাসের তারতম্যের ওপর কোনো বিতর্ক হলে সেখানে সভ্য বিতর্কের সর্বোচ্চ নৈতিকতা মান্য করা উচিত : 'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া পিওপল অব দ্য বুক-এর সঙ্গে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যার দোষ করেছে। আর তোমরা বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের প্রতি যা এসেছে তার প্রতি এবং আমাদের ঈশ্বর আর তোমাদের ঈশ্বর তো একই, আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী' (29:46)।

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুতর ফারাক থাকা সত্ত্বেও, ইসলাম সাধারণ যুক্তি খুঁজতে এবং তাদের ব্যাপকতা উপভোগ করতে আগ্রহী : 'বলো, হে কিতাবীগণ, তোমরা এসব কথার দিক এসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদাত না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা (অন্ততপক্ষে) নিশ্চয় মুসলমান (ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কাছে সমর্পণকারী)' (3:64)। এ ছাড়া, সম্পর্ক থাকা উচিত শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় (ধর্মবিশ্বাস) বিষয়গুলির এরকম আবরণ থাকলেও, মুসলমান ও খ্রিস্টানের মাঝে ভূরাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করার জন্য এটা ভুল জায়গা নয়।

ইসলামের সর্বশেষ পয়গম্বরের সময় পৃথিবীতে প্রাধান্য ছিল দুটি প্রধান শক্তির, পূর্বে পারস্যের সম্রাট এবং পশ্চিম রোমান শাসক। পারসিরা ছিল আগুনের উপাসক এবং রোমানরা খ্রিস্টান। মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল স্বাভাবিকভাবেই রোমানদের প্রতি। ওই দুই শক্তির দীর্ঘ সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ইসলাম শুরুতে সাক্ষী হয়েছিল খ্রিস্টানদের পরাজয়ের, কিন্তু কোরান এই ভবিষ্যদ্বাণী (যা পরে সত্যি হয়েছিল) করেছিল যে এই স্রোতের পরিবর্তন ঘটবে : 'রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে, আর তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সব ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন। আর তিনি মহাক্রমশালী, পরম দয়ালু' (30:2-5)

বেশ কিছু বছর পর, যদিও ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে আরবীয় উপসাগরে এবং একে একটি দেশ এবং একটি উদীয়মান শক্তিতে জমাট করে তোলে, দুই বিশাল সাম্রাজ্যের ফাঁকে। উভয়েই এর মধ্যে গুরুতর আশঙ্কা করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর আক্রমণ শুরু করেছিল, প্রথমে তাদের আরব সঙ্গী সব উপজাতিকে দিয়ে এবং তারপর তাদের বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা। সেই অপরিহার্য মিলিটারি সংঘর্ষের ফলাফল হয়েছিল প্রায় অত্যাশ্চর্য, ইসলামিক শক্তির দৈন্যের সঙ্গে, সংখ্যা ও সরঞ্জাম উভয় দিক থেকেই, তাদের শক্তি একেবারেই কম।

প্রাচ্যে পারস্য সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল এবং এর অধীনে যেসব মানুষ ছিল তারা প্রায় সবাই ইসলাম বেছে নিল। পশ্চিমে রোমান শাসকের কর্তৃত্ব ফিরে এল, এবং এক শতাব্দীরও কম সময়ে,

এক বহুত্ববাদী ইসলামিক শাসক সেই সময়ের জ্ঞাত পৃথিবীর অর্ধেকেরও

বেশি অংশ নিজের দখলে নিয়ে এসেছিল। চার্চ দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে গ্রিক হেরিটেজকে রক্ষা করেছিল ইসলামিক সভ্যতাই এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর বিকাশ ঘটিয়েছিল, যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র (অ্যালজ্যাব্রা শব্দটি আরবি এবং বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হয়েছে মুসলানদের দ্বারা, সংগীত, দর্শন প্রভৃতি এ ছাড়া ছিল ধর্মীয় বিজ্ঞান ও আরবি সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব, এবং যখন প্রেস উদ্ভাবন হল, এর প্রডাকশনের অধিকাংশই ছিল আরবি উৎসের অনুবাদ।

মুসলমান শাসক দুর্বল হতেই ইউরোপ প্রতি-আক্রমণ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে রয়েছে পূর্বে ক্রুসেড এবং পশ্চিমে ইসলামিক স্পেনকে হারিয়ে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার জয়। এঁরা দুজন স্পেন থেকে মুসলমান ও ইহুদিদের ধর্মীয় মতবাদ দূর করেন এবং নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়, শুরু হয় পরাক্রমী শাসকের আমল এবং দেশ-পরিচালিত দাসবাণিজ্য।

ক্রুসেড ছিল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল সরাসরি দখল করার একটি প্রচেষ্টা। সেই সময়, যুক্তি ছিল মুসলমানদের থেকে জেরুজালেমের খ্রিস্টধর্মের পবিত্র স্থানগুলি মুক্ত করতে হবে, এবং দুই শতাব্দীরও বেশি

ক্রুসেড চলেছিল, যা ছিল ধর্মীয় আতঙ্ক এবং যা আজও পাশ্চাত্যের মনে সংগোপনে রয়ে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে। এটা চলছে যদিও মূলস্রোতের সমকালীন খ্রিস্টত্ব ক্রুসেডের নিন্দা করেছে এবং একে আখ্যা দিয়েছে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ রূপে যা খ্রিস্টত্বের পোশাক পরিধান করে ছিল এই নৈরাজ্য ঘটানোর সময়, সুতরাং বলা যায়, খ্রিস্টত্বকে বাধা দিয়েছিল ক্রুসেড।

'ক্রুসেড' (ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় রূপেই) শব্দটি ভাষায় স্থান পেয়েছে সম্মানজনক শব্দ রূপে, যার ভেতরে রয়েছে গভীরভাবে উচ্চারিত কাল্পনিক স্বর। বহু খ্রিস্টানের, যাজক ও প্রচারক, মতো আমরাও বিশ্বাস করি, আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রুসেড সম্পর্কে খ্রিস্টত্বের আবার শিক্ষা নেওয়া উচিত, কেননা এটি ইতিমধ্যে স্প্যানিশ ইকুইজিশন ও জার্মান হলোকাস্টের প্রেক্ষিতে বড় সাফল্য পেয়েছ। নতুন পৃথিবীর শৃঙ্খলার প্রস্তুতির জন্য ক্রুসেডের সঠিক মূল্যায়নের স্বীকৃতি দিতে একটি সচেতন প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে, মানবতার দুটি গোষ্ঠীর মাঝে পুনর্মূল্যায়নের নতুন দ্বারা খুলে দিতে পারে, যে দুটি গোষ্ঠীর প্রতিটিতে রয়েছে এক বিলিয়ন মানুষ এবং হয়তো এটাই প্রতিহত করতে সাহায্য করবে সিউডো-রিলিজিয়াস মানসিকতার ফলে উদ্ভূত নৈরাজ্যকে যা বসনিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি

স্থানে দেখা যাচ্ছে।

এখানে এটা আমার উদ্দেশ্য নয় ক্রুসেড নিয়ে আরও বিশ্লেষণ করার খ্রিস্টান লেখকদের কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে। 15 জুলাই, 1099-এ প্রথম ক্রুসেডের সময় জেরুজালেম দখল প্রসঙ্গে এখানে একজন ক্রুসেডারের রিপোর্ট : 'খোলা তরোয়াল নিয়ে আমাদের মানুষরা শহরময় দৌড়েছিল, তারা কাউকে ছাড়েনি, এমনকি যারা ব্যাকুল হয়ে ক্ষমা চেয়েছিল তাদেরও ছাড়েনি। আপনি যদি সেখানে থাকতেন, তাহলে আপনার পা রক্তে রাঙা হয়ে উঠত গোড়ালি পর্যন্ত। আমি আর কী বলব? তাদের মধ্যে একজনকেও জীবিত থাকতে দেওয়া হয়নি। তারা মহিলা ও শিশুদেরও ছাড়েনি। ঘোড়াগুলোর

হাঁটু পর্যন্ত, নাহ্ লাগাম পর্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। এটা ছিল ঈশ্বরের একটি দুর্দান্ত বিচার। (কন, নর্ম্যান। দ্য পারস্যুট অব দ্য মিলেনিয়াম। ব্যাম্বার গাসকোয়েন-এ উদ্ধৃত। দ্য ক্রিশ্চিয়ানস, ব্যাম্বার গাসকোয়েন (লন্ডন : জোনাথন কেপ, লন্ডন, 1977) 113)

1202 সালে, চতুর্থ ক্রুসেড ভেনিস থেকে চলে যায় এবং যাওয়ার পথে প্রবেশ করে ক্রিশ্চিয়ান কনস্তান্তিনোপলে, যেখানে তারা গোটা শহরে অত্যাচার চালিয়েছিল এত নৈরাজ্য খাড়া করে যে পোপ স্বয়ং তাঁর নিজস্ব ক্রুসেডারদের তিরস্কার করেন একটি বার্তায়, বলেন : 'এটা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং ছিল খ্রিস্টানদের প্রতি, যাতে তোমাদের তরোয়াল রক্তে রাঙা হয়েছে। তোমরা জেরুজালেম দখল করোনি, বরং করেছ কনস্তান্তিনোপল। এটা স্বর্গীয় সমৃদ্ধিতে পূর্ণ নয় যেখানে তোমাদের মন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, বরং এটা ছিল পার্থিব। তোমাদের কাছে কিছুই পবিত্র ছিল না। তোমরা বিবাহিত মহিলা, বিধবা এমনকি সন্ন্যাসিনীকেও ছাড়ানো। তোমরা ঈশ্বরের চার্চের গভীর পবিত্রতা ধ্বংস করেছ, নির্যাতিতদের পবিত্র জিনিসপত্র চুরি করেছ, অগুন্তি চিত্র ও সন্তদের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট করেছ। তোমাদের মধ্যে গ্রিক চার্চ দেখা যাচ্ছে শয়তানের ক্রিয়াকলাপে এটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়। (গাসকোয়েন, ব্যাম্বার। দ্য ক্রিশ্চিয়ানস। লন্ডন : জোনাথন কেপ, 1977, 119) যদি খ্রিস্টান কনস্তান্তিনোপলে ক্রুসেডাররা এসব করেছিল সত্যি হয়, তাহলে তারা 'বিধর্মী' মুসলমানদের ক্ষেত্রে কী করেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

আধুনিক কালের একটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক, যদিও, মুসলমানদের প্রতি হোলি সি-র দৃষ্টিভঙ্গিতে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল, আশা করা যায় এটি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে আরও উন্নত বোঝাপড়ায় অনুঘটকের কাজ করবে। যাইহোক, 1905 সালে পোপ আর্বান দ্বিতীয় (যিনি আর্বান দ্য ব্লেসড নামেও পরিচিত ছিলেন), তিনিই প্রথম ক্রুসেডের ডাক দেন, মুসলমানদের

তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন ‘ঈশ্বরহীন মানুষ, মূর্তি উপাসক, খ্রিস্টের শত্রু, কুকুর, শাশ্বত অগ্নিতে পোড়াটাই নিয়তি’ প্রভৃতি নামে। পোপ পল ষষ্ঠ-র অধীনে প্রস্তুত 1965-এর জ্ঞানকোষ নস্ট্রা অ্যাটেট মুসলমানদের দেখেছে সম্পূর্ণ বিপরীত আলোকে :

‘মুসলমানদের প্রতিও চার্চ খুব সম্মানপূর্বক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে’, বলা হয়েছে ওই ডকুমেন্টে. এবং এর পর লেখা হয়েছে যে মুসলমানরা একক ঈশ্বরকে মান্য করে, তিনি হলেন আব্রাহামের ঈশ্বর, যার প্রতি ইসলামিক বিশ্বাস নিজেকে সমর্পণ করে খুশি : উপাসনা, প্রার্থনা এবং জাকাত দেওয়া, যিশু ও তাঁর কুমারী মা মেরিকে শ্রদ্ধা এবং তাঁদের প্রফেট ও ঈশ্বরের বার্তাবাহক রূপে বিবেচনা করে।

ক্রুসেডের পর থেকে, ইউরোপ ও মুসলমান বিশ্বের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে ইউরোপিয়ান দেশগুলির ঔপনিবেশিক অ্যাজেন্ডা দ্বারা। এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সব ইসলামিক দেশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার কবলে ছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু ঔপনিবেশিকতাবাদ আরেকটি রূপ ধরেছে, নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ, যার নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার ভিত্তি হল সেনাবাহিনী দিয়ে দখল নয়, আর্থিক ক্ষমতা বিস্তার।

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামের অবয়ব

পাশ্চাত্যে ধর্ম শব্দটির ব্যবহার একটি অখণ্ড ব্যবস্থা হিসেবে, ব্যক্তিক ও ধর্মীয়রূপে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ণত্ব প্রকাশে বোঝাতে পর্যাপ্ত নয়। ইসলাম অনুসারীদের কাছে এর পূর্ণরূপকে বলা হয় শরিয়ত, আবার শরিয়তের তিনটি ভাগ যা হল উপাসনা, নীতিনিয়ম ও আইনি ব্যবস্থা যা আরবিট্রারি, এগুলি নিবিড়ভাবে আন্তঃসম্পর্কিত এবং অখণ্ড। যা ব্যক্তির জন্য নৈতিক সেটাই ধর্মীয় নৈতিকতা গঠন করে, এবং নৈতিকতা কোনো ফাঁপা আইনি ব্যবস্থা থাকতে পারে না। অন্তরাত্মা (বিবেক এবং উদ্দেশ্য) ও বাহ্যিক রূপ (ক্রিয়াকলাপ ও পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ) হওয়া উচিত সম্প্রীতির, সংঘর্ষের নয়, এবং উপাসনার ব্যবস্থা ব্যক্তিকে ইসলামের এই বাস্তবতায় পৌঁছতে প্রস্তুত করে। এর চেয়ে কম কিছু হল প্রতারণা ও জাল।

শরিয়তের একটি সাধারণ রূপরেখা

শরিয়তের উৎস

শরিয়তের প্রাথমিক উৎস অবশ্যই কোরান, ঈশ্বরের আক্ষরিক শব্দ। কোরানে সব বিষয়ের পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে, ধর্মমতের প্রতিষ্ঠান (এক থেকে তিন অধ্যায় দেখুন) থেকে

পরম নৈতিক মানের সংজ্ঞা ও অনুমোদনযোগ্য ও অননুমোদনযোগ্য ব্যবহারের নিয়ম।এটি উপাসনার নীতির বর্ণনা দেয় এবং একটি অখণ্ড আইনি ব্যবস্থার রূপরেখা গঠন করে যার সম্পর্কিত পারিবারিক আইন, আর্থিক নিয়ম, ফৌজদারি বিধি, সামাজিক আচরণ, চুক্তি, যুদ্ধ ও শান্তির নৈতিকতা, সরকারের বিন্যাস (এবং একে বিবেচনা করা হয় গণতন্ত্রের ইসলামিক অগ্রদূত), মানবাধিকার,

অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক, উত্তরাধিকার, কর ব্যবস্থা (জাকাত) প্রভৃতির সঙ্গে। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এমন কোনো বিষয় নেই যার সামান্য উল্লেখও নেই কোরানে।

ধর্মবিশ্বাস (আকিদা) ও প্রার্থনা (ইবাদাত) প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক রূপরেখা ও অপরিবর্তনীয় নীতি গঠন করেছে কোরান, যদিও মানব যোগাযোগ (মুয়ামালাত) সম্পর্কিত আইন পরিচালনার বিষয়টি, কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, নিয়ন্ত্রত হয় নমনীয় সাধারণ নির্দেশকা দ্বারা। শরিয়তের অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলিকে বলা হয় মুয়ামালাত, সেজন্যই এগুলি সীমিত। এগুলি ব্যবহারশাস্ত্রের (নির্দেশের তারতম্য) বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্তনে অসাধারণ অবদান জুগিয়েছে, বিভিন্ন ধারার মতামত সন্নিবিষ্ট করেছে এবং কয়েক শতাব্দীর মূল্যবান মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করেছে যা বিভিন্ন স্থান ও সময়ের জন্য মানানসই এবং প্রমাণ করেছে শরিয়ত স্থাণু বা নিঃশেষযোগ্য নয়।

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হল পয়গম্বর মহম্মদের সুন্নাহ (ঐতিহ্য) যা তিনি নির্দেশ, নিষেধ, করেছেন বা পয়গম্বর রূপে তাঁর ক্ষমতায় স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সুন্নাহ সবসময় কোরানকে ব্যাখ্যা করে, একে বিশ্লেষণ করে, এর কিছু স্থানে সাধারণত্ব ও পরিপূরকের বিস্তৃত বর্ণনা করে। সুন্নাহের বিজ্ঞান, বিশেষ করে পয়গম্বরের বাণীর সত্যতা নিরূপণের প্রক্রিয়া

সম্ভবত বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে সঠিক শাখা। সুন্নাহ একত্রকারীদের দ্বারা কঠোর নির্দেশিকা অনুসরিত হয়েছে রিপোর্টার ও সাক্ষীদের শৃঙ্খল খুঁজতে এবং সবার ওপরে, কোনো নথিবদ্ধ সুন্নাহর সঙ্গে কোরান বা প্রতিষ্ঠিত সত্য বা সাধারণ জ্ঞানের কোনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিরোধ নেই এটা নিরুপণ করতে তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠা করে নির্ভুলতার বিজ্ঞান রূপে।

শরিয়তের তৃতীয় উৎস পরিচালনা করে যখন কোনো বিষয় কোরান বা সুন্নাহ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে নিষ্পত্তি করা যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুরূপতা বা সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয় বিশ্লেষণী যৌক্তিকতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা একটি নতুন বিষয়ের সমান এবং ইতিমধ্যে কোরান এবং/অথবা সুন্নাহ দ্বারা মীমাংসিত। ইতিহাদ হল একটি পরিভাষা যা ইঙ্গিত করে লক্ষ্য নথিপত্রের (ধর্মীয়, বিজ্ঞানগত, পারিসাংখ্যিক ও সামাজিক) ব্যবহার শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ নির্ণয় করতে, শুধু এতে যেন কোরান বা সুন্নাহর সঙ্গে বা শরিয়তের লক্ষ্যের সঙ্গে কোনোরকম সংঘাত না হয়, যা উপস্থাপন করা হবে অনতিবিলম্বে। সুতরাং শরিয়ত কোনো স্থাণু নিয়ম নয় যা যেকোনো সময়, যে কোনো স্থানে কপি করে প্রয়োগ করা যাবে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন চলাকালীন, ব্যবহারিক নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামিক নীতিনিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে যা উদ্ভূত

হয়েছিল পয়গম্বর ও কোরানের পথনির্দেশিকায় নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নির্দেশের জন্য। এই নীতিনিয়মের একটি উদাহরণ হল, ‘প্রয়োজন নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করে’। উদাহরণস্বরূপ, শূকরমাংস ভক্ষণ বেআইনি, কিন্তু মরভূমিতে পথ হারানো কোনো পথিকের কাছে যদি একমাত্র লভ্য খাদ্য থাকে শূকরমাংস, এটা ভক্ষণ অনুমোদনযোগ্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, যতক্ষণ না আইনি খাদ্য লভ্য হচ্ছে। অন্যান্য নিয়মের উদাহরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, ‘দুটি খারাপের মধ্যে কম খারাপকে বেছে নেওয়া উচিত যখন উভয়কে কিছুতেই এড়ানো যাবে না।’ ‘ব্যক্তিস্বার্থের আগে অগ্রাধিকার পাবে সমষ্টিগত স্বার্থ’ এবং ‘ক্ষতি অপসারণ

করতে হবে’। সামগ্রিক নিয়ম হল, যখন কোরান ও সুন্নাহর সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, ‘যেখানে কল্যাণ যায়, সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও গমন করে।’

শরিয়তের লক্ষ্য

শরিয়তের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই পৃথিবী এবং তারপরও মানুষের কল্যাণ। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, সম্প্রদায়ের প্রয়োজনকে ভাগ করা হয়েছে খুব আবশ্যক, সাধারণ আবশ্যকতা এবং পরিপূরক প্রয়োজন (যা জীবনকে আরও উপভোগ্য করে), গুরুত্বের এরকম শৃঙ্খলায়। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে প্রথম ক্যাটেগরি, যা 'শরিয়তের পাঁচটি লক্ষ্য' রূপে সুপরিচিত, যার উদ্দেশ্য হল (1) জীবন, (2) মন, (3) ধর্ম, (4) মালিকানা ও অধিকারভুক্তির সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা এবং (5) প্রজাতির প্রজনন ও সংরক্ষণ। এর প্রতিটিই আরও কয়েকটি ভাগ ও শাখায় এবং উপ-শাখায় বিভক্ত যাতে আছে এমনকি দেখার মতো ছোটখাটো বিবরণ এবং প্রতিটিই উপযুক্ত নৈতিক এবং/অথবা আইনি নিয়মে পুষ্ট। সব প্ররোচনা আটকে এই অনন্ত বিষয়টির গভীর জলে প্রবেশ করতে হবে, প্রতিটি ক্যাটেগরি থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো সংগ্রহ করতে পারি যাতে চিত্রটা স্পষ্ট হয় ও বোঝা যায় :

জীবনের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা : জীবনের অধিকার এবং তা রক্ষা করার কর্তব্য এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হত্যার নিষেধাজ্ঞার যুক্তি দেয় এবং অনুমোদনযোগ্য ব্যতিক্রম নির্ধার করে, যেমন আইনি যুদ্ধ অথবা বিচারে শাস্তি। অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ এবং রুগ্ন স্বাস্থ্য এড়িয়ে যেতে যা করতে হবে সেগুলিই ইসলামিক কর্তব্য, যেমন খাদ্যগ্রহণের নিয়ম, শারীরিক ফিটনেসের উৎসাহ, ব্যক্তি, ঘর, রাস্তা ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মবিধি। মহম্মদের অন্যতম একটি উৎসাহজনক শিক্ষা হল যে 'আল্লাহ এমন কোনো অসুস্থতা সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক নেই...কিছু ইতিমধ্যে জানা গেছে এবং কিছু জানা যায়নি,' যা ধারাবাহিক গবেষণার প্রেরণা জোগায়। কোয়ারান্টাইনের নীতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন মহম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যদি কোনো শহরে মারাত্মক মহামারী থাকে, এর ভেতরে যেও না যদি তুমি বাইরে থাকো, বা বেরিয়ো না যদি তুমি ইতিমধ্যে ভেতরে থাকো।'

কৃষিতে উৎসাহ জোগানো উল্লেখযোগ্য। পয়গম্বর মহম্মদের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে (1) যদি বিচারের দিন এসে পড়ে এবং তোমার হাতে একটি চারা আছে রোপণ করার জন্য, তাড়াতাড়ি করো এবং তুমি যদি পারো এটা বপন করো, (2) কোনো ভূমিতে যে-ই চাষ করুক না কেন এর কৃষি থেকে প্রতিটি আত্মার খাওয়ার জন্য সে পুরস্কৃত হবে, পাখি বা পশু, এমনকি কোনো চোরও যদি এর থেকে ভক্ষণ করে, (3) যুদ্ধের জন্যই কোনো গাছ কাটা বা পোড়ানো উচিত নয়। বাস্তুতান্ত্রিক সচেতনতা ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা বাধ্যতামূলক। কোরানো জলচক্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ ও দূষণহীনতা মহম্মদ

দ্বারা বাধ্যতামূলক। তাঁর অন্যতম নির্দেশ হল 'খাদ্য বাদে অন্য কোনো কারণে কোনো পাখি বা পশু হত্যা করা যাবে না', এতে পশুদের প্রতি দয়ালু মনোভাব ফুটে ওঠে এবং তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকা যায়।

মনের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা। যেকোনো মানবের হলমার্ক হল মন। এটিই হল সেই হাতিয়ার যার দ্বারা আমরা ভালো ও খারাপ জানতে পারি এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি ও আমাদের চারপাশে প্রকৃতিকে উদ্ভাবন করতে পারি। ধ্যান ও প্রতিফলন হল ধর্মীয় কর্তব্য এবং কোরান তাদের নিন্দা করেছে যাদের মন দেওয়া হয়েছে কিন্তু এগুলির ব্যবহার করে না। চিন্তার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশ হল মানুষের মৌলিক অধিকার।

ইসলামে জ্ঞানের অন্বেষণ শুধু একটি অধিকারই নয়, বরং এটি একটি কর্তব্য। কোরানের প্রথম উন্মোচিত শব্দ হল 'পড়ো' নির্দেশ, এবং কোরান বলে,

'তারা সমান নয়, যাদের জ্ঞান আছে এংব যাদের নেই, যেমন আলো ও অন্ধকার সমান নয়,' এবং 'তাঁর সেবকের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে সবচেয়ে বেশি লুকোয়।' বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে, আইনি জার্গনে, বলা হয়েছে, 'তাঁর সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ঐতিহ্য উন্মোচন,' এবং এটা যারা করতে সক্ষম তাদের কর্তব্য এটা করা। মনের ওপর সেন্সরশিপ বাতিল হয়েছে, এবং কোনো মানুষই কোনোভাবে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করতে পারে না। শুধু মনই সেন্সরশিপ থেকে সুরক্ষা পাবে না, বরং উৎপীড়ন, ভয়, উদ্বেগ ও চাপও এর থেকে মুক্ত। যা মনকে মূক করে বা হত্যা করে সেটা ঘৃণার্হ, সেজন্যই মদ্যপান ও মাদক সেবন ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ, এমনকি সামাজিক সম্পর্কেও নয়।

ধর্মের স্বাধীনতা : বহু ইসলামিক পণ্ডিত ধর্মের অধিকারকে প্রথম স্থান দিয়েছেন, কিন্তু অবশ্যই জীবন ও মনের সততা ব্যতীত, ধর্মীয় কর্তব্য পালন অসম্ভব। ধর্মের স্বাধীনতা ও প্রার্থনা মানুষের মৌলিক অধিকার, এবং এটা শুধুমাত্র মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কাউকে এটা পালনে বাধা দেওয়া ইসলাম বিরোধী, কোরান বলে : 'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' (2:256)। প্রার্থনাগৃহ অবশ্যই নির্মিত হবে, এবং এগুলির বিরুদ্ধে কোনোরূপ বাধা আরোপ করাকে বিবেচনা করা হবে ভূমিতে অমঙ্গল ছড়ানো রূপে (কোরান বলে : 'আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ – যেখানে আল্লাহর নাম সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়'। (22:40)) যখন মুসলমানরা আক্রান্ত হয় তাদের ধর্মীয় কারণে, তাদের রক্ষণের অধিকার ও দায়িত্ব আছে।

ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিরক্ষা : মালিকানার অধিকার উলঙ্ঘনীয় এবং সম্পদ দখলে রাখার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি বা সীমা নেই, শুধু এটা আইনগতভাবে সিদ্ধ হতে হবে। বেআইনি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ইসলাম দ্বারা বর্ণিত, এর অন্তর্ভুক্ত তেজারতি কারবার, ফাঁকি ও প্রতারণা, চুরি, একচেটিয়া কারবার প্রভৃতি। বাণিজ্যিক লেনদেন ও বিনিময়ের নিয়ম নির্দিষ্ট করা আছে। পুঁজির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এর দায়িত্ব, যার অন্তর্ভুক্ত করায়ন ও সমাজের প্রয়োজনে অবদান জোগানো। জাকাত কর বাধ্যতামূলক এবং এক বছর সময়কালে যত টাকা থাকে তার মোটামুটি 2.5 শতাংশের সমান জাকাত, কৃষি, পশুপালন, জমিজমা ও শিল্প থেকে আয় নির্ধারণের অন্যান্য ফর্মুলা আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ হল সমগ্র সম্প্রদায়ের যৌথ দায়িত্ব, এবং কেউ নির্বাসিত দ্বীপে রয়েছে এমন আচরণ করতে পারবে না।

প্রজাতির প্রজনন ও সংরক্ষণ : পবিত্র ও ডকুমেন্টেড নিকাহনামার মধ্য দিয়ে স্বীকৃত বিবাহ হল কোনো দম্পতির পরিবার হিসেবে জুটি বাঁধার এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার একমাত্র আইনি উপায় (শরিয়ত পারিবারিক বন্ধন উচ্চারণ করেছে যা এক দম্পতির বিবাহকে অনুমতি দান করে)। বংশের শুদ্ধতা (চিহ্নিত মা-বাবা দ্বারা আইনি জন্ম) এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে একজনের মা-বাবা ও একজনের সন্তানকে জানার অধিকার অবশ্যই থাকবে। স্তন্যপানকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মোটামুটি দুবছরের জন্য।

বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা (বিবাহ পূর্ববর্তী যৌনতা সহ) পাপ. এবং আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ যদি চারজন স্বীকৃত সাক্ষী থাকে। পরিবার পরিকল্পনা (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে) অনুমোদিত, কিন্তু এটা কোনো জীবনকে হত্যার অধিকার দেয় না (অর্থাৎ গর্ভপাত, ভ্রূণের বাঁচার, একটি ইচ্ছে বা জন্মগত গুণের উত্তরাধিকার ও আপ্যায়নের অধিকার আছে)।

প্রজননের আগ্রহ ও বন্ধ্যাত্বর চিকিৎসা অনুমোদিত, কিন্তু শরিয়তে যতটা অনুমোদিত শুধুমাত্র ততটাই।

পাশ্চাত্যের ঢঙে দত্তক নেওয়া অনুমোদিত নয়, কিন্তু লালনপালনের অভিভাবকত্ব অথবা দরিদ্র শিশুদের স্পনসরশিপকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে সেবাকার্য রূপে, এবং এসব অভ্যাস সেইসব মিথ্যাকে বাতিল করে যেখানে দাবি করা হয় সত্যিকারের পারিবারিক বন্ধন, যখন বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। শিশুকে তার উৎস সম্পর্কে সত্য জানানো উচিত। পরিণত বয়সে পৌঁছনোর পর, একটি পরিবারভুক্ত কোনো জৈবিক সম্পর্কহীন শিশুকে ওই পরিবারের জৈবিক সম্পর্কযুক্ত কোনো শিশুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হল, তারা ভাই ও বোন এই যুক্তিতে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, বাস্তবে যদিও তারা

তা নয়।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মা-বাবা ও শিশুর মাঝে অধিকার ও দায়িত্বেরও বিস্তারিত বিবরণ আছে। পারিবারিক আচরণ ও উত্তরাধিকারের নিয়ম নির্দিষ্টকৃত। পরিবারকে টিকিয়ে রাখা হল স্বামীর দায়িত্ব, যেখানে স্ত্রীর আর্থিক অবদান তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী হবে। মহিলাদের কাজের অধিকার আছে (পারিবারিক সংহতির সঙ্গে মানানসই কাজ), এবং ব্যক্তিগত মালিকানা, উত্তরাধিকার ও শিক্ষার পরম স্বাধীনতা আছে তাদের। পুরুষ ও মহিলা হল সমান মানব ও আধ্যাত্মিক সম্পদ, এবং ইসলামের দায়বদ্ধতা (ও নিষেধাজ্ঞা) তাদের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হয়।

চার্চ ও রাষ্ট্র

চার্চ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার যে সিদ্ধান্ত ইউরোপ নিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত জ্ঞানী সিদ্ধান্ত। প্রথমদিকে চার্চগুলো (বনাম ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা) জীবনের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া দখলদারি করত যেখানে যিশুর বাণীর কোনো ভিত্তি ছিল না। চিন্তার স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এর শক্তি বাধা দিয়েছিল যা বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উদাহরণে প্রতিফলিত। পরে, আমেরিকাও একই ধারা অনুসরণ করে

ওই একই কারণে, পাশাপাশি একটি ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যময় সমাজে একটি ধর্মবিশ্বাস অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে, এটাও এড়াতে চেয়েছিল তারা। আমেরিকায় প্রথমদিকের অনেক প্রব্রজনকারী প্রকৃতপক্ষে পালিয়ে এসেছিল ইউরোপ থেকে, কেননা ইউরোপীয় খ্রিস্টত্বের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন তারা সহ্য করতে পারেনি।

যেমন আমি এটা উপলব্ধি করি, চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ হল ধারাবাহিক বিষয় খ্রিস্টধর্মের আবশ্যক আদর্শের সঙ্গে, মানবাত্মাকে শুদ্ধ করা এবং মানব চরিত্রকে মহান করার এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, রাষ্ট্রের সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নয়। নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী যিশুর রাজত্ব এই পৃথিবীর ছিল না। নিউ টেস্টামেন্ট বলেছে, যখন জিজ্ঞেস করা হল, রোমান সিজারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো আইনি কি না, তিনি একটি মুদ্রার দিকে তাকালেন যার ওপর সিজারের মুখ খোদিত ছিল এবং বললেন : 'যা সিজারের সেটাই সিজারকে প্রতিদান দাও, ঈশ্বরকে তাই দাও যা ঈশ্বরের।' অন্যান্য সব

যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরাও বহুত্ববাদের ধারণার প্রশংসা করে যা সবার জন্য ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে গোঁড়ামি বা ধর্মীয় নিপীড়ন ছাড়াই, ঘটনাচক্রে যার ইসলামিক শিক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

হয়তো এখনই সময় এটা প্রকাশ করার বহু মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি একটি সংরক্ষণ অনুভব করেছিল আমেরিকা ও পাশ্চাত্যে, যারা অনুভব করেছিল যে চার্চ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতির অপব্যবহার হয়েছে এবং ঈশ্বর ও নৈতিকতার সর্বজনীন মূল্যবোধ এবং নম্রতাকে বাদ দিতে এটি পরিচালিত হয়েছে, যেসব ঈশ্বরের থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পাওয়া যায়। গত চার দশক ধরে আমেরিকান মিডিয়ায় ঈশ্বর 'মৃত' কি না এনিয়ে জোরদার বিতর্ক চেলেছে এবং এটি অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর মৃত নন, বাস্তবে তাঁর কর্তৃত্ব অনুভব করা যায় এবং একজন ব্যক্তি ও একটি জাতি হিসেবে আমাদের জীবন নিয়ে কী করা উচিত এবিষয়ে তাঁর শিক্ষণ অনুধাবনযোগ্য। নৈতিক আচরণ অথবা পর্নোগ্রাফি

এবং অন্যান্য সামাজিক উপাদান যা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথককরণ উলঙ্ঘন করার দায়ে অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে আহ্বান করা হয়েছে। মূল বিষয়টি হল 'ঈশ্বরের অধীনে একটি জাতি' এবং 'ঈশ্বরে আমাদের আস্থা', যা দিনকে দিন ফাঁপা হচ্ছে, এবং যদি সবকিছু এই একই দিকে চলতে থাকে, তাহলে আর খুব বেশি দেরি নেই এগুলি বাস্তবে প্রযুক্ত হওয়ার আগেই সাংবিধানিক সংশোধনী এগুলিকে মুছে দেবে। ইসলামিক দেশগুলিতে মুসলমানরা চায় ইসলামিক আইনের দ্বারা শাসিত হতে, পাশ্চাত্যে যারা এটা শুনেছে তাদের একটি সর্বজনীন প্রতিক্রিয়া হল, ওই আইন গ্রহণযোগ্য নয় এবং আতঙ্কের। দুর্ভাগ্যজনক ইউরোপীয় ইতিহাস যা চার্চ ও রাষ্ট্রকে পথক করেছে, তারা খুব সহজেই এই ধারণাকে ঘৃণা সহকারে পরিহার করে এবং একে অন্ধকার যুগের প্রত্যাগমন বলে ভাবে যখন ইউরোপ পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল চার্চের উৎপীড়নমূলক কর্তৃত্বের অধীনে। এই উপংসহার সঠিক নয়, কেননা দুটো পরিস্থিতি একই নয়।

ইসলামের বিষয়টি যখন আমরা অধ্যয়ন করি, আমরা দেখি যে চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের নীতি একেবারেই প্রযোজ্য নয়। খ্রিস্টধর্মে কোনো রাষ্ট্র নেই আবার ইসলামে নেই কোনো চার্চ, যার জন্য একটি পরিস্থিতিকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা একেবারেই অসম্ভব। বৃত্তি বা স্কলারশিপ থাকলেও ইসলামে কোনো যাজক সম্প্রদায় নেই, না আছে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। তথ্য হল কয়েকটি ইসলামিক দেশে ইসলামিক বিদ্যায় স্নাতকরা বিশেষ পোশাক পরিধান করলেও তার কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য নেই, এতে তারা যাজকও হয় না বা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় তাদের উচ্চাসনও দেওয়া হয় না। ইসলামের প্রথম

দিকে এরকম কোনো পোশাক পরিধান করা হত না, অনেক পরে এই প্রথা শুরু হয়েছিল, কেননা সমাজ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পোশাককে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমন মিলিটারি বা পুলিশের উর্দি থাকে এবং ডাক্তারের থাকে সাদা কোট। ধর্মীয় জ্ঞান ও বিদ্যা সবার জন্য উন্মুক্ত, এবং এর ব্যাখ্যা কোনো এলিট গোষ্ঠীর একচেটিয়া বা সুবিধার জন্য নয়, শিক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষত্ব

প্রশংসিত ও সম্মাননীয়, কিন্তু পবিত্রতম নয়। এটা ইসলামের অংশ নয় যে ধর্মীয় পণ্ডিতদেরই সরকার চালানো উচিত, কেননা তাঁদের অবশ্যই বিভিন্ন শাখার বৈচিত্র্যময় বিভাগে টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব থাকে। ব্যক্তিগত যোগ্যতায় দপ্তরে কাজ করা উচিত এবং পদগুলি মুসলমান ও অমুসলমান উভয় নাগরিকের জন্যই উন্মুক্ত।

উপরে বর্ণিত শরিয়তের লক্ষ্য সম্পর্কে দ্রুত বিবরণেও এটা অপরিহার্যভাবে ফুটে ওঠে যে এগুলির প্রয়োগ ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্র থেকে ঊর্ধ্বে, সরকারের রাজত্বে। শরিয়ত, সংবিধান, হল আইন প্রণয়ন ও ভিতের উৎস যেখান থেকে আইন উদ্ভূত। যদিও খ্রিস্টান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিস্টত্বের সঙ্গে বেমানান নয়, কিন্তু এটা ইসলামের ক্ষেত্রে বলা যায় না, কেননা এটা কোরান ও সুন্নাহের অনেক মতকেই উপেক্ষা করে, নিষ্ক্রিয় করে বা বদল করে, যা ইসলামের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসের বিপরীত। এসব তথ্য গ্রহণের পাশাপাশি এই তথ্য স্পষ্ট করা উচিত যে খ্রিস্টান সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য সেটা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হতেও পারে যদিও প্রত্যেকেই ধর্মের স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকার প্রচার করে।

ইসলামিক বা খ্রিস্টান জাতি কারো নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের ওপর চাপানো উচিত নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘটনা এরকম নয়, পাশ্চাত্যে, সর্বজনীনভাবে, মুসলমানদের তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের আত্ম-নিয়ম থেকে বাধা দেওয়া হয়। এটা নিরপেক্ষ স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র উভয়েই সমর্থন করে যা তাদের ভুলভাবে চিহ্নিত করে ইসলামিক রূপে, কিন্তু অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় মানবাধিকার রক্ষা, পুরুষ ও মহিলার প্রাথমিক স্বাধীনতা এবং সরকার মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা বিষয়গুলি, যেগুলি প্রকৃত ইসলামিক সরকারের হলমার্ক। প্রকৃতপক্ষে এখন এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যাকে বিবেচনা করা যেতে পারে

একটি প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্রের আদর্শ প্রতিনিধি রূপে। যখনই জমাট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কোনো ইসলামিক পক্ষকে জয়ের দিকে নিয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান গণতন্ত্রগুলো ও শাসন ক্ষমতায় থাকা স্বৈরতন্ত্রগুলোর সত্যবিরোধী ও অপমানজনক জোট ওই প্রচেষ্টাকে উচ্ছেদ করতে হস্তক্ষেপ করে, একে কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না নিজেকে প্রমাণ বা অপ্রমাণের।

হায়! গণতন্ত্র প্রচলিত ব্যবস্থা ধরে রাখার দিকে যত নজর দেয় তার কিছুই গণতন্ত্রের নিজেকে ধরে রাখার প্রতি দেয় না।

ইসলামিক আইন দ্বারা শাসিত ইসলামিক রাষ্ট্রের চাহিদার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা হয় যে সেইসব দেশের বাসিন্দা সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও ইহুদি নাগরিকদের অধিকারভুক্ত হয় না ওই আইন। এই অভিযোগ সংবাদমাধ্যম ও রাজনীতিক উভয়েই বারবার উত্থাপন করে, কিন্তু বাস্তবে এর কোনো সত্যতা নেই। এই সত্য খুব কম প্রচারিত যে ইসলামিক ব্যবস্থায়, অনন্যভাবে, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড নিজের মতো করে আইনসম্মতভাবে পালন করতে পারে তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের নির্দেশিকা অনুযায়ী। এরকম সমস্যাগুলো, যদিও খুব কমই আছে, এবং পারিবারিক বিষয়ে জড়িত (যেমন বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং এরকম আরও কিছু)। অন্যথা, তাদের ধর্মগ্রন্থ বা তার বিকল্প নিয়ে কোনো সংঘাত নেই, সংখ্যালঘুরা কখনো অবিচারের শিকার হয় না, সংখ্যাগুরুদের জন্য যে আইন ওই একই আইন প্রযোজ্য সংখ্যালঘুদের জন্যও (ধর্মীয় শাস্তি বাদে), এটাই শক্তিশালী গণতন্ত্রের নীতি ধরে রাখে।

আমরা সম্পূর্ণ সৎ হব না যদি আমরা শরিয়ৎ প্রণয়নের প্রশ্ন সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য ও আশঙ্কা ব্যক্ত না করি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অবনমন ঘটেছে স্লোগান ও আবেগের ঘেরাটোপে। কিছু অতিরিক্ত উৎসাহী যুব একে রূপান্তরিত করেছে অন্যান্য ধর্মের অনুগতদের সঙ্গে সংঘর্ষে। যদিও শরিয়ত

তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়, যার লক্ষ্য হল ভীতি নিরসন, উদ্বেগ দূরীকরণ এবং ব্যবহারিক উপায়ে উত্তম নাগরিকত্বের নীতি প্রদর্শন, যে কাজটা মূলধারার মুসলমানরা এবং ইসলামিক আন্দোলনের সংখ্যাগরিষ্ঠরা সক্রিয়ভাবে করে চলেছে, যদিও পাশ্চাত্যের সংবাদমাধ্যম ও পেশাদারি রাজনৈতিক বৃত্তে এর প্রায় কোনো প্রচার নেই।

ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলি যা গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে নিষ্পন্ন হয় তাদের জন্যও এখানে কিছু পরামর্শ দরকার এখানে। যদিও ইসলামের আকর্ষণীয় ব্যানারের অধীনে তারা ভোটের লড়াই করে, এইসঙ্গে তাদের উচিত শরিয়তের লক্ষ্যগুলি অনুধাবনের জন্য তাদের প্রস্তুত করা বিস্তারিত কর্মসূচি ভোটারদের কাছে উপস্থাপন করা। ইসলাম কোনো জাদু শব্দ নয় যে এটাই তাদের দেশের বোঝাস্বরূপ জটিল আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন করে দেবে। উপযুক্ত সমাধান পেতে শরিয়তের মধ্যে গভীর টেকনিক্যাল ও বিশেষীকৃত অধ্যয়নের ডিজাইন করতে হবে কাজ করার জন্য।

গণতন্ত্রের জন্য যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, ইসলামের ব্যাখ্যায় তাদের সৎ থাকা উচিত তাদের যে কোনো ঘোষণায় এবং গণতন্ত্রের রেটোরিক শোষণের ছলনা করা উচিত নয় যতদিন তারা ক্ষমতায় থাকবে। গণতন্ত্রে ক্ষমতা দখল করতে কোনো ইসলামিক দলের জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হল প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা, তারপর এই ব্যর্থতা স্বীকারে অনিহা, ভুল করে চিন্তা করা যে তাদের ব্যর্থতাকে বর্ণনা করা হবে ইসলামের ব্যর্থতা রূপে। এরা হয় রিগিং করে বা পরের নির্বাচনের ব্যবস্থা বিলোপ করে, জাতিকে সুযোগই দেয় না তাদের অপসারণ করার, এবং এরপর, হায়, আরেকটা স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে ওঠে! ইসলামিক দলগুলো এখনও এই স্বাদ পায়নি, এবং ট্রায়ালের আগে তাদের বিচার করা ঠিক নয়।

এসব ইসলামিক দলের বিজ্ঞাপন, যারা তাদের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা ধরে রাখে,

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান গণতন্ত্রের উচিত তাদের সমর্থন প্রত্যাখ্যান করা, নৈতিকভাবে বা অন্যভাবে। যদি কখনো ইসলামিক দল ক্ষমতায় আসে, আমরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছি উল্লেখিত কাজ না করতে, এজন্য শুধুমাত্র ইসলামিক আইন দরকার নয়, বরং সবার ওপরে, ইসলামিক চরিত্র ও সততাও দরকার। কিছু বিখ্যাত উদাহরণ আছে যা দাবি করে, এমনকি শক্তি জোগায়, যে শরিয়ত দ্বারা তারা শাসন করে, আমাদের মতে, সেগুলি হল, সততার অভাব অথবা শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব অথবা উভয়ই। শরিয়তের গোটা প্রসঙ্গকে সম্মান না দিয়ে এর ফৌজদারি ধারার বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রে শরিয়তকে সীমিত রাখাটা প্রতারণা। শাসনবৃত্তের ব্যাপক দুর্নীতি এবং কোনো স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে দেশের সম্পদের লোভী শোষণ সমাধানের কোনো চেষ্টা না করে সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়াটা কখনো ইসলামে জায়গা পায় না।

ইসলামে জাতির কাছে শাসক দায়বদ্ধ এবং নিজেকে এর প্রভু নয়, সেবক হিসেবে বিবেচনা করে। সাধারণ মানুষ আর উচ্চবিত্তদের আলাদা করে ভাবা বা তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাত করা ইসলাম বিরোধী কাজ। শরিয়ত প্রয়োগ করা উচিত শেষ থেকে শুরুতে নয়, বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। অপরাধ হ্রাস করতে ইসলাম ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে : ইসলামিক সচেতনতা প্রচার (শিক্ষা ও পথনির্দেশিকার মাধ্যমে), যেসব সমস্যায় অপরাধ (সামাজিক ও আর্থিক) বৃদ্ধি হতে পারে তা প্রতিরোধ করা, এবং তৃতীয়ত আইনসম্মত শাস্তি – সেই পরিস্থিতিতে। তারপর, আইন জানে কোনো সীমা নেই।

গণতন্ত্র

আজকাল প্রায়ই এই প্রশ্ন ওঠে যে ইসলাম কি গণতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই। এটা খেয়াল করা বেশ বিস্ময়কর যে যারা বলে মানাসই নয়, তারা হল

এমন বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী যে তারা অন্যকিছু প্রায় ভাগই করে না। এই শতাব্দীর মোড়ে একদল বুদ্ধিশীল মুসলমান পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে তারা প্রস্তাব দেয় পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার যা কিছু ভালোর পাশাপাশি যা কিছু খারাপ সবই ইসলামে গ্রহণ করতে, বর্তমান সময়ে সেই বিভ্রান্তির পতন দেখা যাচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়ে এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক অবিচারে যা অনেকেই বাতিল করেছে, প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা কিছু পশ্চিমা, গণতন্ত্র সহ। ইসলামিক দেশগুলির নিরপেক্ষ স্বৈরাচারীরা, অবশ্যই, গণতন্ত্র মানে না নিজেরা স্বৈরতান্ত্রিক থাকতে চায় বলে, এবং তাদের মুসলমান জনগণের কাছে গণতন্ত্র উপস্থাপনও করার ক্ষেত্রেও তাদের ন্যস্ত স্বার্থ থাকে, যা অ-ইসলামীয়। যেসব স্বৈরাচারী ইসলামিক পোশাক পরিধান করে এবং দাবি করে যে ইসলামিক হও, তারা এইসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে যে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসে গণতন্ত্র অচেনা, এবং তাদের আছে বশংবদ অনুচর ও বেতনভূক ধর্মীয় পণ্ডিতরা যারা ম্যাকাভেলিয়ান ভূমিকা পালনে উৎসুক।

পাশ্চাত্যে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞাপন, সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক বৃত্ত উভয় ক্ষেত্রেই, নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামকে একটি গণতন্ত্র-বিরোধী ধর্ম, যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই, রূপে প্রচার করে। তাদের লক্ষ্য অবশ্যই ইসলামকে পাশ্চাত্যের জনগণের মতামতের শরীর থেকে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া, মুসলমানদের অবনমিত করার সম্ভাব্য ও কাল্পনিক উপায়গুলি ব্যবহার করে এমন উপায়ে যা কঠিন নীতি গ্রহণযোগ্য করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সরকারের অন্যায্য অবস্থানকে সমর্থন করে। তারা মাঝে মধ্যে এই বিষয়টি উত্থাপন করে যে অধিকাংশ ইসলামিক দেশে গণতন্ত্রের অভাব রয়েছে। যা তারা একেবারেই উল্লেখ করে না তা হল, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে স্বৈরাচারীদের একমাত্র সক্রিয় সমর্থন জোগায় পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রগুলো।

পশ্চিমের গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলির সঙ্গে, যা বহু শতাব্দী পরে ক্রমবিবর্তিত হয়েছিল, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইসলামিক ব্যবস্থার তুলনা করা

মনে হয় বাস্তবোচিত নয়। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি আরেকটির প্রতিরূপ নয়, তারা শুধুমাত্র গণতন্ত্রের মূল ধারণা ও নীতিগুলিকে ভাগ করে

নেয়। কোরান (চোদ্দ শতাব্দী আগে) সুরা-র নীতি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছে, যার অর্থ সমস্যা ও বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হবে যৌথ বিবেচনা ও আলোচনা দ্বারা। ইসলামের প্রথম দিনগুলিতে (পয়গম্বর ও তাঁর উত্তরসূরিদের সময়ে) এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ একে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হিসেবে বিবেচনা করা হত।

একমাত্র পয়গম্বরকে তাঁর ক্ষমতায় কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই মান্য করা হত, কিন্তু ধর্ম ব্যাখ্যা ও প্রচারের, যা তিনি আল্লাহর থেকে পেয়েছিলেন, ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মহম্মদ স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ, তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের ভবিষ্যৎ বলার অথবা অন্যান্য মানুষের যে জ্ঞান রয়েছে নিজের নিজের ক্ষেত্রে তার চেয়ে মহম্মদের বেশি জ্ঞান নেই। বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে, যা ছিল মুসলমান ও আরব মূর্তি-উপাসকদের মধ্যে প্রথম এবং ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ, তাঁর স্বল্প বাহিনী কোথায় অবস্থান করবে সেই সম্পর্কে পয়গম্বর তখন একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা করেছিলেন। যখন তাঁর এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'এই অবস্থান কি ঈশ্বর প্রেরিত যা আমাদের মান্য করতে হবে কোনো প্রশ্ন ছাড়া, নাকি এটি কৌশল ও পরিকল্পনার একটি মতামত?' মহম্মদ তাকে উত্তর দেন যে এটা হল কৌশল ও পরিকল্পনার মতামত। তাঁর শিষ্য তখন বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে আরেকটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করে। পয়গম্বর সেটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবে প্রণয়ন করেন, ফলাফল ছিল দুর্দান্ত জয়।

কয়েক বছর পর, শত্রুরা মদিনায় মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠায়। মদিনায় থাকা এবং সেখানেই শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা ছিল মহম্মদের, কিন্তু আলোচনায় দেখা গেল যে অধিকাংশই

সেখান থেকে বেরিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে চায় মাউন্ট উহুদ-এ, যা মদিনা থেকে বেশ দূরে, মহম্মদ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নিলেন সুরা-র বাধ্যবাধকতায়। মুসলমানরা প্রাথমিকভাবে জয় পেয়েছিল। এই যুদ্ধে, একটি তিরন্দাজ বাহিনী পাহাড়ের ওপর অবস্থান করেছিল, তারা ভাবল যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের পজিশন ছেড়ে দিতে শুরু করেছিল, এরপর তারা অন্যদের সঙ্গে শত্রুপক্ষকে তাড়া করতে থাকে, পয়গম্বর তাদের যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা তারা অমান্য করেছিল। মহম্মদ তাদের বলেছিলেন, যাই ঘটুক না কেন, অবস্থান ছাড়বে না। খালেদ ইবন আল ওয়ালীদ (অসাধারণ যোদ্ধা যিনি শত্রুপক্ষের একটি ক্যাভালরি রেজিমেন্টকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) মুসলমানদের এই দুর্বলতা খেয়াল করেছিলেন, এবং পাহাড়ের শীর্ষে বৃত্ত রচনা করেন, এরপর পেছন থেকে তিনি মুসলমানদের আক্রমণ করেন সবাইকে সম্পূর্ণ হতচকিত করে। এটা ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় এবং সবকিছু চলে যেতে

থাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, বিশাল পরাজয়ের পর তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও মুসলমানদের দিক থেকে সেখানে দুটো ভুল ছিল, তারপর কোরানের আয়াত উল্লেখ করে মহম্মদ বলেছিলেন, 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের (তোমার শিষ্য) জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো' (3:159)। সুরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রযোজ্য, এমনকি কোরানে উল্লেখিত খুব ছোটখাটো ব্যাপারেও, কোরানের নির্দেশ এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে প্রয়োগ করা যায়, যেমন শিশু স্তন্যপানের অভ্যেস ছাড়ানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া উচিত পারস্পরিক সুরা (আলোচনা) ও মা-বাবার সম্মতি দ্বারা।

পয়গম্বরের মৃত্যুর অর্থ পয়গম্বরতার অবসান, কেননা তাঁর পর আর কোনো পয়গম্বর ছিল না, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা। উত্তরসূরি নির্বাচনের বিষয়টি চলছিল খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে, প্রার্থী ছিলেন একাধিক, যতক্ষণ না আবু

বকর, পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, সর্বজনীন সিদ্ধান্তে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনায়, প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক নীতি ফের উচ্চারিত ও বিশ্লেষিত হয়েছিল, সবচেয়ে বেশি স্বয়ং আবু বকর দ্বারা। তাহলে আমরা এখানে কোনো নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে তাঁর ভূমিকার সংক্ষেপিত তালিকা তৈরি করতে পারি :

1. পদটি অবশ্যই জনগণের মতামত দ্বারা পূর্ণ হবে (আবু বকর তৎক্ষণাৎ অন্যদের, যাঁরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না, মতামত চেয়েছিলেন এটা নিশ্চিত করতে যে তাঁরা এই বিষয়ে একমত)।

2. এই নিযুক্তি ছিল শর্তসাপেক্ষ ("আমাকে মান্য করো যতদিন আমি ঈশ্বরকে মান্য করি", ঘোষণা করেছিলেন খলিফা)।

3. জনগণকে আরও অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে তারা যে মতামত দিয়েছিল পরিস্থিতি সাপেক্ষে সেটা তারা ফিরিয়ে নিতে পারে (আবু বকর ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি যদি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কাজ করেন, তাহলে জনগণের তাঁকে মান্য করা উচিত নয়)।

4. শাসক হল জাতির কর্মচারী, তাদের দ্বারা নিযুক্ত তাদের প্রতি কর্তব্য পালনে (প্রথম দিকের কিছু দিন আবু বকর তাঁর জীবনযাপনের জন্য নিজস্ব ব্যবসার কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগিয়েছিলেন, জনগণ তখন তাঁকে

বাধ্য করে একজন গড় মুসলমানের, না ধনী না দরিদ্র, সমান বেতন গ্রহণ করতে, পূর্ণ সময় কাজ করার জন্য)।

5. রাষ্ট্রপ্রধান শুধুই উচ্চবিত্তর স্বার্থ দেখবেন না, তাদের পণবন্দি হবেন না বা বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করবেন না। তিনি বলেছিলেন : "তোমাদের সবচেয়ে দুর্বল আমার সঙ্গে শক্তিশালী যতক্ষণ তার প্রাপ্য আমি নিশ্চিত করি, এবং

তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে দুর্বল আমার সঙ্গে যতক্ষণ আমি তার থেকে যা প্রাপ্য গ্রহণ করি)।"

সংক্ষেপে, আজকাল অধিকাংশ ইসলামিক দেশে যা অনুশীলন করা হয় এটা হল তার নাস্তিকতা। কোনো সন্দেহ নেই যে যদি সবকিছু সেই অভিমুখে ক্রমবিবর্তিত হয় যা ইসলাম দ্বারা প্রস্তাবিত, কেননা ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছে এবং ইসলামিক সভ্যতা উন্নত হয়েছে পরিণত ও অভিজাতভাবে। মুসলমানরা সরকারের একটি রূপ অর্জন করবে যা আধুনিক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করবে এবং পাশাপাশি মুক্ত থাকবে তাদের সমস্ত দুর্বলতা থেকে।

কখনো কখনো সবকিছু এগিয়েছিল খুব উজ্জ্বলতার সঙ্গে। দ্বিতীয় খলিফা, ওমর, জাতিকে আবার সতর্ক করেন যে তিনি যখন ঠিক তখন জাতির উচিত তাঁকে সমর্থন করা আর যদি তিনি ভুল করেন সংশোধন করা। যার উত্তরে একজন মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল, 'আপনি এটা না বললে ভালো থাকতেন না এবং আমরা ভালো হব না যদি আমরা এটা গ্রহণ না করি।'

দুর্ভাগ্যবশত এই প্রবণতা ভঙ্গ হয়ে যায় ইসলামিক ইতিহাসের অন্যতম দুঃখজনক, যদি সবচেয়ে দুঃখজনক না হয়, ঘটনায়। খলিফা উথমান একটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেখানে তাঁকে স্বজনপোষণে অভিযুক্ত এবং হত্যা করা হয়েছিল। ঠিক তার পরই উথমানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন খলিফা আলি, যিনি ছিলেন পয়গম্বরের জ্ঞাতি, তাঁর জামাই এবং তাঁর ভালোবাসার পাত্র। তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যক্তিগত মেধা এবং যখন তাঁকে খলিফা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, উল্লেখযাগ্য ব্যক্তিরা ও জনগণ ডুবে যায় তাঁর আনুগত্যে। যদিও সিরিয়ার (তখন ইসলামিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত) গভর্নর মুয়াইয়া তাঁর বশ্যতা মানতে অস্বীকার করেন এবং শেষপর্যন্ত মদিনার দিকে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা দেন। মদিনার দিকে তাঁর যুদ্ধযাত্রার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল উথমানের হত্যার বদলা নেওয়া, কেননা তিনি সম্পর্কিত ছিলেন

প্রয়াত খলিফার (উভয়েই উমাইয়াদ উপজাতিভুক্ত), দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ তিনি বদলা দাবি করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী

হলেন আলি, কিন্তু মুয়াইয়া ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং তাঁর শিবিরে ছিল কয়েকজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, সেজন্য তিনি একটি প্রতারণাপূর্ণ শালিশিতে নিরাপদ থাকলেন। কিছু ক্ষুব্ধ মানুষ মুয়াইয়া ও আলি উভয়কেই হত্যার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা সফল হয়েছিল শুধু আলিকে হত্যা করতে। গোটা জাতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বোঝাপড়ার পর, আলির পুত্র হাসান স্থলাভিষিক্ত হলেন, তিনি রক্তপাত এড়াতে মুয়াইয়ার কর্তৃত্ব মেনে নেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন।

এর কিছু পর, কর্তৃত্বের বলে বলীয়ান মুয়াইয়া ফের জাতিকে হতবাক করে দেন, তাদের বাধ্য করেন তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে গ্রহণ করতে, তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে, তিনি শাস্তি ও পুরস্কারের কৌশল অবলম্বন করেন। আলির দ্বিতীয় পুত্র হুসেইন বিদ্রোহ করেন ইয়াজিদের (সেসময় মুয়াইয়া ও হাসান উভয়েরই মৃত্যু ঘটেছে) বিরুদ্ধে। ইরাকের বাসিন্দারা হুসেইনকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার অধীনে তারা তাকে ত্যাগ করে। পালিয়ে যাওয়া বা শর্তাধীন আত্মসমর্পণের পরিবর্তে হুসেইন এবং তাঁর বিশ্বস্ত সত্তরজন অনুগামী ইয়াজিদের হাজার হাজার সেনার মুখোমুখি হন এবং সাহসের সঙ্গে কারবালা প্রান্তরে আত্মবলিদান দেন। বহু পরে এটা প্রমাণিত হয়েছিল উমাইয়াদ সাম্রাজ্যের কফিনে প্রথম পেরেক রূপে, যা টিকেছিল মোটামুটি দুই শতাব্দী ধরে।

এই ঘটনা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে আন্দোলন রূপে শিয়াজমের জন্ম হিসেবে, কট্টরপন্থীদের দ্বারা পূর্ণ, যারা নিজেদের আলির অনুগামী বলেছিল (আরবিতে 'শিয়া')। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষকদের একটি প্রতিবাদ রূপে, কিন্তু রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করা সম্ভব ছিল না, কেননা ন্যায়ের জন্য লড়াই হল একটি ধর্মীয় হুকুম। সময় চলে যাওয়ার পর, শিয়াজম গ্রহণ করল

একটি ইসলামিক গোষ্ঠীর রূপ, যার কেন্দ্রে ছিল এই বিশ্বাস যে খলিফা হওয়ার যোগ্যতা আলির থাকা উচিত, তারপর, তাঁর বংশধরদের (উত্তরসূরি হিসেবে জ্যেষ্ঠ সন্তান)।

শিয়াদের বহু গৌণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কেননা তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এর মধ্যে প্রধান হল দ্বাদশ শিয়া যারা বিশ্বাস করত যে তারা দ্বাদশ উত্তরাধিকারী (ইমাম), যে রহস্যজনকভাবে শিশু অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসেছিল একদিন বহু প্রতীক্ষিত মেহদি (আল-মেহদি : ভাষা, 'নির্দেশিত ব্যক্তি', ন্যায়পরায়ণ নেতা যিনি পয়গম্বর হয়েছিলেন কিছু আহদিথ আসবে বলে এবং ডে অব জাজমেন্ট-এর আগে অনুগামীদের জয়ের পথে নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন। সম্পাদিত) হয়ে এবং ন্যায়পরায়ণতায় শাসন করে। মুসলমানদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ শিয়া, বাকিরা সবাই ঐতিহ্যগতভাবে সুন্নি। সুন্নিদের বিরুদ্ধে শিয়াদের ক্রোধ আছে, অভিযুক্ত অন্যায্য কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রথমেই বশ্যতা স্বীকারের জন্য, কিন্তু দুপক্ষই কোরান ও মহম্মদের পয়গম্বরতায় বিশ্বাস করে। প্রতি বছর শিয়ারা কারবালার যুদ্ধ ও হুসেনের শহিদত্ব স্মরণ করে, অনেকে নিজেকে নিজে প্রহার করে, দুঃখে অনুতাপ করে যে তাদের পূর্বপুরুষ হুসেনের তাঁর লড়াইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মৃত্যু ঘটে। এটা এমন এক সহজবোধ্য সত্য যে সুন্নিরাও আলি ও তাঁর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসেনকে শ্রদ্ধা করে, সহানুভূতি জানায় এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে।

এবং এখন ইতিহাসের জন্য পর্যাপ্ত, এমনকি যদিও আমরা চেষ্টা করেছি একে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলতে, এবং ফিরে যাই গণতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে। দুঃখজনক ঐতিহাসিক এপিসোড শুধুমাত্র সম্পর্কিত ছিল একটি হাত থেকে অন্য হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্তে, এবং সেটাও জাতির ইচ্ছেয় নয়, তরোয়াল ও সোনার শক্তিতে। এসব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলাফল ক্রমাগত পরবর্তী মুসলমান ইতিহাসকে সন্তাপে পরিণত করেছে। সার্বভৌম শাসকরা সর্বদা খুঁজে পেয়েছিলেন শিক্ষিত

ব্যক্তিদের, যাঁরা উন্মুখ থাকতেন কৃতজ্ঞ ও সমতার জন্য, তাদের অন্যায্য শাসনকে ক্ষমা করতেন, আর অন্যরা, যাদের সাহস ছিল তিক্ত বলার, তাদের জীবন বা স্বাধীনতা দিয়ে এর মূল্য দিতে হয়েছিল। খলিফা যখন ভালো হতেন, সবকিছু ঠিকঠাক চলত, আর তিনি খারাপ হলে সবকিছু হত খারাপ, এবং দ্বিতীয়টিই বেশি ঘটেছে। দুটি ক্ষেত্রেই, জনগণের কর্তৃত্ব ও অধিকার ন্যস্ত ছিল শাসকের কাছে। যদিও ইসলামিক সভ্যতা এর পরও ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ সবসময় মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে জ্ঞানের অন্বেষণ, বিজ্ঞানে চমৎকারিত্ব এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা হল ধর্মীয় কর্তব্য। এই সব ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ দিয়েছিল সরকার, কিন্তু শাসক বনাম জনগণের অধিকার অথবা তাদের লাগামহীন শক্তির বিধিনিষেধ সম্পর্কে কোনো কথা বা লেখার চেষ্টা দমিয়ে রাখত। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বিবেচনা করলে আমরা পাই মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর তাদের লেখা শক্তিশালী এবং চমৎকার, কিন্তু অপর্যাপ্ত।

মুসলমান ভ্রাতৃত্বের প্রতি, যারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে আছে, আমি বলতে চাই যে গণতন্ত্র কখনো মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান ছিল না, এর দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে সার্বভৌমত্ব ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে। আমরা অন্ধ হব যদি আমাদের ইতিহাস এই সত্য আমাদের কাছে উন্মোচন করতে না পারে। যারা ইসলামকে গণতন্ত্রের প্রতি অসহিষ্ণু বলে অভিযোগ

করে, তাদের প্রতি আমি বলি, তোমরা ভুল, কেননা ওই অভিযোগের সঙ্গে ইসলামের বিশাল ব্যবধান আছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতি ভেটো দেওয়া যায় বা ভেটো ফিরিয়ে নেওয়া যায়, যদি তাঁর বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অর্জনে সক্ষম হয়। ইসলামের অধীনে, সংবিধানের ভিত্তি হল শরিয়ত, সেজন্য শরিয়তের সঙ্গে কোনো আইনের সংঘাত ঘটলে সেটি অসাংবিধানিক। এই প্রেক্ষাপটে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একশো শতাংশ তার নিজস্ব পথে চলে।

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত উগ্রপন্থা, হিংসাত্মক আচরণ বা নিরপেক্ষ

সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় সরকারের যে অভিযোগ তা ছাড়িয়ে সমকালীন ইসলামিক পুনর্জাগরণ অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। একটি বিস্তৃত, আলোকিত এবং প্রায় মূলধারা আবিষ্কার করেছে ধর্মের বাস্তবতা এবং জেগে উঠেছে ইতিহাসের শিক্ষায়। এটা অন্যদের বিরুদ্ধে ফাঁপা স্লোগানে ইন্ধন পায়নি, বরং শুধুমাত্র সংস্কারের দিকে তথ্যাভিজ্ঞ প্রচেষ্টার দ্বারা এটা হয়েছে। যাইহোক, ইসলামিক পণ্ডিতরা বহু আগে মতামত দিয়েছেন যে একটি অ-ইসলামিক রাষ্ট্র যেখানে ন্যায় আছে সেটা অত্যাচার ও অবিচারে পূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্রের চেয়ে ভালো।

অন্তরাত্মা
ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ

পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ধর্মবিধির যে-ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর নবি, কেয়ামত, নসিব বা নিয়তির উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে (নিয়তির উপর বিশ্বাস করা মানে এই নয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা সংক্রান্ত ধারণাকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে। তবে এ কথা অবশ্যই বলা হচ্ছে যে, ভাল হোক মন্দ, কোনো কিছুরই উপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।)।" ধর্মবিধিকে আমরা এই আলোচনায় 'অনুশাসন' হিসাবে উপস্থাপন করিনি; বরং তাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছি। কোরানের ধারা অনুসরণ করেই এই কাজ করা হয়েছে। কোরান মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহ্বান জানায়; নানা রকম সংকেত দেয়; এমন-এমন প্রশ্ন তুলে ধরে, যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে দেয়; কোনো মত চাপিয়ে দেয় না, উপলব্ধি করতে দেয়।

ইসলামের ধর্মমত (আল্লাহ কেবল একজনই) এবং তার ধর্মবিধি অন্যান্য আব্রাহামীয় ধর্ম, যেমন খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরই মতো। ইসলামের পূর্বে আল্লাহর যে-দূতদের আবির্ভাব হয়েছিল, ইসলামে তো বলতে গেলে তাঁদেরও মুসলমানই বলা হয়ছে। তাঁরাও ইসলামকেই অনুসরণ করতেন। ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্ম-সমর্পণ। এই অধ্যায়ে আমরা ইসলাম ধর্ম ও তার শরিয়ত নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। এই অংশে আমরা সেই দিকটা নিয়ে আলোচনা করব, যার সাহায্যে ইসলামকে আরও নির্দিষ্ট করে বোঝা যাবে। সেই দিকটা হল, ইবাদত। ইসলামের মূলে রয়েছে ইবাদত। কারণ এই ধর্মের উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি মুসলমানকে এমন ভাবে গড়ে তোলা, যাতে সমগ্র ইসলামি সমাজকে মজবুত করা যেতে পারে। মানে, একটা মজবুত বাড়ি তৈরি

করার জন্য, তার প্রত্যেকটা ইটকে মজবুত হবে।

ইসলামে ইবাদত করতেই হবে। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটা পাঁচটা ক্ষেত্র। পয়গম্বর মহম্মদ যার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, "এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে (সাক্ষী সহ), আল্লাহ কেবল একজনই, এবং মহম্মদ তাঁর নবি; সবাইকে নমাজ করতে হবে; জাকাত দিতে হবে; রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে; এবং যদি কারো সামর্থ্য থাকে, তাহলে তাকে হজ যাত্রা করতে হবে।" পয়গম্বর মহম্মদের কাছে একদিন ইসলামের সংজ্ঞা জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন তিনি উল্লিখিত পাঁচটি মূল স্তম্ভের কথা বলেছিলেন। বলা বাহুল্য, শুধুই স্তম্ভ দিয়ে বাড়ি তৈরি করা যায় না। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এই স্তম্ভই একটা বাড়িকে শক্ত করে ধরে রাখে। ইসলামকে যাঁরা শুধুই ইবাদতের নিয়ম পালন করা একটা ধর্ম বলে মনে করেন, তাঁরা আসলে ইসলামকে সম্যক ভাবে এবং তার সামগ্রিক রূপকে বুঝতে পারেন না। তাঁরা এ-ও ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কী উদ্দেশ্যে ইবাদতের এই নিয়মগুলো মেনে চলা হয়। আসলে এগুলোর মাধ্যমে ইবাদতকারীর চরিত্র গঠন হয়।

ইবাদতের জন্য কম করে 'ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ'-এর প্রয়োজন হয়। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কোনো নৈতিক কাজ করা হয়, তাহলে সেটাকে আল্লাহর ইবাদত করা বলা হয়। দান-ধ্যানের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে যে যত ইচ্ছা জাকাত দিতে পারেন। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে যা-ই করুক না-কেন, সেই সব কাজকেই নীতিগত ভাবে ইবাদত বলে মেনে নেওয়া হয়। এবার আমরা এই পাঁচটি মূল স্তম্ভ নিয়ে আলোচনা করব।

শহাদাহ। এ হল একেবারে সোজা সাপটা একটা কথা। সেই কথাটা হল এই যে, "আল্লাহ কেবল একজনই, এবং মহম্মদ হলেন তাঁর নবি। এই কথার সাক্ষী আমি নিজে।" এটাই হল ইসলামের জগতে প্রবেশ করার মূল মন্ত্র। দু'জন সাক্ষীর সামনে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কথাটা বললেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা যায়। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার এটাই নিয়ম। শাহদাহর মধ্যেই রয়েছে আরেকটা জিনিস। আজান। প্রত্যেক বার নমাজের সময় এই আজান দিতে হয়। এসব শুধু কথার কথা নয় যে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই হয়ে গেল। যখন কেউ এই শাহদাহ বা ঘোষণা করে যে, সে আল্লাহকে নিজের ঈশ্বর বলে মেনেছে, তার মানে সে চায় যে, আল্লাহ তার জীবনকে গড়ে তুলুক, তাকে পথ দেখাক, এবং সে এই কথা দিচ্ছে যে, সে কোনো মানুষের কথায়, কোনো জিনিসে, নিজের খেয়ালে বা নিজের কামনা-বাসনায় প্রভাবিত হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, মহম্মদই হলেন আল্লাহর নবি, তার মানে সে এই অঙ্গীকার করছে যে, সে মহম্মদের শিক্ষা ও আদেশ মেনে চলবে, এবং এ-ও মেনে নেবে যে, এই শিক্ষা ও আদেশের উৎস হল দিব্যতা। "আল্লাহ

কেবল একজনই, এবং মহম্মদ হলেন তাঁর রসুল।"— যুগ-যুগ ধরে ইসলামি আইনে ও লেখাপত্রে এই শাহদাহর সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

সালাত। ইসলামের সালাত বা প্রার্থনার যে-রীতি ও নীতি, তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। প্রার্থনা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তার থেকে তা ভিন্ন। সালাত মানে হল, যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো স্থানে আল্লাহর কাছে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা, তাঁর কাছে সঠিক পথের দিশা জানতে চাওয়া, তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া। সালাত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে কোরানে, এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষই এই ভাবে প্রার্থনা করতে পারেন। ইসলামি প্রার্থনার রীতি-নীতি বিশেষ এক আঙ্গিক ও সারমর্ম ধারণ করে। এর মধ্যে শরীর ও আত্মার সমন্বয় হয়। এটা দিনে পাঁচবার করা হয়। ভোর বেলায়, দুপুরে, বিকালে, সূর্যাস্তের পর এবং অন্ধকার হওয়ার পর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে (বাড়ি, মসজিদ, উদ্যান, কর্মস্থান ইত্যাদি) কেউ একা বা অনেকে একসঙ্গে মিলে, মুসলমান পুরুষ ও/বা মহিলা এই সালাত করতে পারেন। একসঙ্গে অনেকে মিলে সালাত করলে, তাঁদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হিসাবে সালাত করাবেন। শুক্রবারের দুপুরের নমাজ সবাইকে একসঙ্গে মিলে (যৌথ ভাবে) করতেই হবে। সেটা করতে হবে মসজিদে, এবং তা করার আগে খুতবা করতে হবে। ইমাম (সালাতের পরিচালক) কিন্তু পুরোহিত নন। এমনও কোনো নিয়ম নেই যে, একজন ব্যক্তিই প্রত্যেক সালাতের সময় ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন। অবশ্য, ইমাম করা উচিত তাঁকেই যিনি কোরানে পণ্ডিত, কোরানের বিষয়ে যাঁর জ্ঞান আছে। ব্যবসায়ী, মজুর, ডাক্তার, শিক্ষক, ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিত, এবং অন্যান্য অনেকেই এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সালাত করার জন্য হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। মুখে জল নিয়ে কুলকুচি করতে হয়, নাকের ফুটো মুছতে হয়, মুখ ধুতে হয়, কনুই অবধি হাত এবং হাঁটু অবধি পা ধুতে হয়, মাথায় ও কানে ভেজা হাত বুলিয়ে নিতে হয়। একে বলে ওজু করা। একবার ওজু করেই বারে-বারে সালাত করা যায়। কিন্তু, সালাত করার পর ঘুমিয়ে পড়লে, প্রস্রাব করলে, মলত্যাগ করলে, বাতকর্ম করলে, পরের বার ফের সালাত করার আগে ফের ওজু করতে হয়। যদি কেউ যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে পুরো স্নান করতে হয়। মাসিক চলাকালীন (সন্তান প্রসবের ফলে) স্রাব হলে মহিলাদের সালাত করতে দেওয়া হয় না। স্রাব বন্ধ হওয়ার পর স্নান করতেই হবে। ঠিক একই নিয়ম পুরুষদের বীর্যপাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে কেউ অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে সনির্বন্ধ আবেদনের মাধ্যমে যে-কোনো সময়ে আল্লাহর প্রার্থনা করতে পারে। এর জন্য কেউ ওজু করতে পারে, আবার না-ও করতে পারে।

সামনে আল্লাহ আছেন বলে মনে করে নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে সালাত করতে হয়। এর জন্য কাবার দিকে মুখ করতে হয়। একক আল্লাহর প্রার্থনা করার জন্য, পরমপিতা আব্রাহাম ও তাঁর পুত্র ইসলাম সর্ব প্রথম যে-মসদিজ স্থাপন করেছিলেন, তা-ই কাবা)। যে-জায়গায় তাঁরা এই মসজিদ স্থাপন করেছিলেন, তা-ই পরে আরবে মক্কা নামে পরিচিত হয়। একমাত্র কাবা মসজিদেরই চারদিকে গোল হয়ে মুসলমানরা সালাত করেন (সে এক দেখার মতো দৃশ্য)। সারা পৃথিবীতেই মুসলমানরা মক্কার দিকে মুখ করে, সরলরেখায় দাঁড়িয়ে সালাত করেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। মহিলারা সাধারণত পিছনের দিকে দাঁড়ান। এটা কোনো ধর্মীয় নিয়ম নয়। আসলে পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝোঁকা বা গড় করার সময় যাতে বাধো-বাধো না-লাগে তার জন্যই মহিলারা পিছনে দাঁড়ান।

সালাত শুরু হয় আল্লাহ হু আকবর বলে। এর অর্থ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাই সালাত করার সময়, সবাই আসলে সারা দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ করে থাকেন। প্রত্যেক সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কোরানের প্রথম অধ্যায়। সেখানে বলা হয়েছে, "হে আল্লাহ, তুমিই এই জগতের প্রতিপালক। তুমি অনন্ত দয়াময়, তুমি অতীব দয়ালু। তুমিই কেয়ামতের দিনের মালিক। আমরা শুধু আপনার দাস। শুধু আপনার থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সহজ-সরল পথ দেখান। যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদের তাদের পথে নিয়ে চলুন। যারা আপনার ক্রোধের শিকার, যারা পথভ্রষ্ট, তাদের পথে আমাদের নিয়ে যাবেন না। হে আল্লাহ।" (1; 1-7)

বাকি সালাতে কোরানের বাকি অংশগুলো পড়া হয়। আল্লাহর সামনে ঝুঁকে ও গড় করে বলতে হয়, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর জয় হোক", "সবার উপরে আছেন আল্লাহ, তাঁর জয় হোক", এবং "যাঁরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাঁদের কথা শুনুন।" এই ভাবে আত্ম নিবেদনের ভাব নিয়ে প্রার্থনা করলে, মনে শান্তি আসে। সালাত শেষ করতে হয় বসে। এই ভাবে থেকে শাহাদাহর প্রতি নিজের বিশ্বাসকে আরও একবার প্রকাশ করতে হয়, এবং আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করা হয় যে, তিনি যেন মহম্মদ ও আব্রাহাম এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন ও অনুসরণকারীদের দোয়া ও শান্তি প্রদান করেন।

বাধ্যতামূলক ভাবেই হোক, বা নিজের মন থেকেই হোক, প্রার্থনা করলে গভীর আধ্যাত্মিকতার ভাব উপলব্ধি করা যায়। এমন এক অনন্য সম্পদকে অর্জন করতেই হয়। এর থেকে শান্তি, প্রশান্তি ও পবিত্রতা লাভ করা যায়। এ মনকে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন করে, এবং আল্লাহর নৈকট্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আশ্চর্যজনক ভাবে এ জীবনের কোলাহলকে শান্ত করে জীবনকে

করে তোলে স্নগ্ধ ও মনোরম। সারাদিনে পাঁচবার সালাত করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম সালাত করতে হয় ভোর বেলায়। দিনের বিভিন্ন সময়ে সালাত করলে ইবাদতকারীর মন-প্রাণ সব সময় ঠিক থাকে। এর ফলে তাঁরা বলতে গেলে কোনো অপকর্ম করার কথা চিন্তা করার অবকাশই পান না।

জাকাত। দান-ধ্যান করার জন্য কেউ খরচ করলে, সেটাকে খুব প্রশংসা করা হয়। মুসলমানরা যাতে যত ইচ্ছা তত এই কাজে খরচ করেন, তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হয়। এই কাজে খরচ করার কোনো সীমা নেই। ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ জাকাতের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল, এটা বাধ্যতামূলক একটা নিয়ম। এটা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এটা করার একটা হিসাব আছে। সাধারণ ভাবে হিসাবটা এ রকম: সারা বছর নানা প্রয়োজনে খরচ করার পর যে-পরিমাণ অর্থ জমা হবে, তার আড়াই শতাংশ জাকাত করার মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। টাকা যদি এমনই ফেলে রাখা হয়, তাহলে তার শাস্তি হল এই যে, সেই টাকা পুরো দিয়ে দিতে হবে চল্লিশ বছরের মধ্যে। এই ভাবে টাকাকে মানুষের সেবায় কাজে লাগানো হয়। টাকা-পয়সা ছাড়াও অন্যান্য ভাবে সম্পত্তি করলে, সেগুলোও কীভাবে জাকাত করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। অন্যান্য উপায়ে সম্পত্তি করা বলতে, কল-কারাখানা চালিয়ে, কৃষিকাজ করে, পশুপালন করে, নির্মাণ কাজের ব্যবসা করে, এবং ইত্যাদি নানা ভাবে অর্থ উপার্জনের কথা বোঝানো হয়েছে।

জাকাত মানে হল ধনীর ধনে গরিবের অধিকার। এটা কোনো মনের ইচ্ছায় করা দান-ধ্যান বা পরোপকার নয়। ইসলামি রাষ্ট্রে জাকাত সংগ্রহ করে সরকার। এটাই হল দেশের বাজেটের মূল উৎস। প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কর ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে এটা সংগ্রহ করা হয়। জাকাতের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী ইসলামি সংগঠনগুলোকে, তাদের কাজ হল, সেই অর্থকে ন্যায়সংগত ভাবে বণ্টন করা; অথবা, সেই সব স্থানে সরাসরি দিয়ে দেওয়া, যেখানে ইসলামি আইনের প্রচলন নেই। সারা পৃথিবীতে এমন বহু দেশই আছে, যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করে। আবার বহু মুসলমানই এমন সব দেশে থাকেন, যেসব দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। সেসব দেশেই জাকাত থেকে সংগৃহীত অর্থ পাঠানো হয়। অবশ্য, জাকাতের টাকা অ-মুসলমানদের জন্যও খরচ করা হয়, যদি তাদের প্রয়োজন থাকে।

সমাজের সবার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হিসাবে কাজ করে জাকাত। এই বন্ধনকেই তো পয়গম্বর মহম্মদ বলেছিলেন, "সমাজের সবাই শরীরের এক-একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। একটা অঙ্গ যদি কষ্ট পায়, তাহলে বাকিরাও তার কষ্টে সামিল হয়ে যায়।" আরবি ভাষায় জাকাত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'পরিশোধন'। অর্থাৎ, নিজের টাকা-পয়সার ন্যায়সংগত একটা অংশ গরিবদের

দান করে সেই টাকাকে পরিশোধন করতে হয়। মুসলমানরা যখন জাকাত করে, তখন তারা সত্যিকার অর্থেই এটা অনুভব করে যে, তারা যে এ কাজ করছে তা এক ধরনের বিনিয়োগ, কোনো ঋণ-শোধ নয়।

রমজানের রোজা (সওম)। ইসলামি চান্দ্র বর্ষের একটি মাস হল রমজান। গ্রেগোরীয় বর্ষের তুলনায় ইসলামি বর্ষ এগারো দিন কম বলে, প্রত্যেক বছর রমজান মাস এগারো দিন করে এগিয়ে আসতে থাকে। সে জন্যই, মানুষ নিজের জীবনের প্রত্যেক বছরেই বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন আবহাওয়ায় রমজানের রোজা রাখে। রমজানের সময় ভোর রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলমানরা অন্ন-জল গ্রহণ করে না। দিনের বেলা যৌন সম্ভোগও করা যায় না। রোজা রাখার সময় এমনকী কেউ নিজের ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে না, এবং কারও প্রতি দুর্ব্যবহারও করতে পারে না।

রমজান অভুক্ত থাকার মাস নয়। তাই রাতের বেলা শরীর পুষ্টি ও জল পেয়ে যায়। সবাইকে অবশ্য এই পরামর্শও দেওয়া থাকে যে, সন্ধ্যায় ও ভোর রাতে পরিমিত আহার গ্রহণ করতে হবে। অসুস্থ, শিশু, শিশুকে স্তন্যপান করাতে থাকা মা, ও বয়স্কদের রোজা রাখতে হয় না।

রোজা রাখলে দৈনন্দিন অভ্যাসকে জয় করা যায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করা যায়, তাই রমজান মাসে আত্ম-সংযম ও ইচ্ছাশক্তির কঠোর অনুশীলন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আত্ম-সংযমই যদি না-থাকে, তাহলে মানুষের আর কী-ই বা থাকল? রোজা রাখলে খুবই সু-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই সময় মানুষ নিজের জাগতিক চাহিদাকে জয় করে আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করে। এই মাসে মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক চেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে, তাকে পুরনুজ্জীবিত করে। এ যেন নিজেকে পরের বছরের জন্য উজ্জীবিত করা। এই মাসের মূল বৈশিষ্ট্যও হল সুগভীর উপাসনা ও দান-ধ্যান। রমজান মাসের শেষে মুসলমানরা ঈদ উদযাপন (ধর্মীয় উৎসব) করে। সকাল বেলা সবাই মিলে নমাজ করে, এবং সারা দিন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। উল্লেখ্য, মুসলমানরা আরও একটা ঈদ উদযাপন করে হজ যাত্রার মরসুম শেষ হওয়ার পর।

হজ যাত্রা। আব্রাহমের একেশ্বরবাদী লক্ষ্য এবং তার পঞ্চম স্তম্ভ হজ যাত্রার সঙ্গে ইসলাম গভীর ভাবে যুক্ত। হজ যাত্রার মাধ্যমে আসলে আল্লাহর প্রতি পরমপিতা আব্রাহামের আনুগত্যের কথা স্মৃতিচারণ করা হয়। পয়গম্বর আব্রাহামকে (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনে বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তবু তিনি আল্লাহর প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে গেছেন। একদিন আল্লাহ তাঁকে এই আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে

তাঁর স্ত্রী হগর এবং ওই সময় তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের একেবারে নির্জন স্থানে যেতে হবে। আল্লাহর প্রতি আব্রাহামের এই আস্থা ছিল যে, আল্লাহ নিশ্চয় তাঁদের কোনো কল্যাণ করবেন। এই আস্থার বলেই আব্রাহম নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে সেই স্থানে রেখে এসেছিলেন। পরে সেখানেই গড়ে উঠেছিল মক্কা শহর। আব্রাহাম তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে রেখে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য যা খাবারদাবার রেখে গিয়েছিলেন, সেসব এক সময় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলল। ইসমাইলের মা তখন হন্যে হয়ে জল খুঁজছিলেন। তাঁকে নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি এক সময় আতঙ্কে ও হতাশায় দিশেহার হয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং অলৌকিক ভাবে জম-জমের কুয়ো বেরিয়ে এল। আব্রাহাম মাঝে-মাঝেই তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে আসতেন। আল্লাহ একদিন আব্রাহমকে এই আদেশ দিলেন যে, তাঁকে ওই স্থানে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রথম মসজিদ স্থাপন করতে হবে। এ-ও বলে দিলেন যে, এ কাজে তাঁকে সাহায্য করবে তাঁর পুত্র ইসমাইল। তারপর ধর্মপ্রাণ লোকেদের বলতে হবে, তাঁরা যেন ওই মসজিদে এসে ইবাদাত করেন, সেই মসজিদকে যেন সবাই মিলে এক তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে তোলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আব্রাহামকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তখন, যখন আল্লাহ তাঁকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, ইসমাইলকে হত্যা করতে হবে। খোদ ইসমাইল তাঁর পিতাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন যে, আল্লাহর আদেশ পালন করতেই হবে। পুত্রের কথা শুনে আব্রাহাম আল্লাহর সেই কঠিন আদেশও পালন করেছিলেন। আব্রাহামের নিষ্ঠা ও আস্থার পরীক্ষা নিয়ে তাঁর পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন আল্লাহ, এবং তাঁদের একটি ভেড়া তোফা দিয়েছিলেন।

হজ যাত্রা শুরু হয়েছিল আব্রাহাম ও ইসমাইলের হাত ধরে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা প্রত্যেক বছর হয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বহু প্রজন্ম পর মানুষ পৌত্তলিকতা অবলম্বন করতে শুরু করল, এবং আল্লাহর উপাসনা স্থলকে নানা মূর্তির স্থল বানিয়ে ফেলল। পৌত্তলিক আরবদের এক-এক গোষ্ঠী তাদের নিজের-নিজের মূর্তি গড়ে তুলল, সেগুলোর একটা করে নাম রাখল, এবং সেগুলোকে এনে স্থাপন করল কাবাতে। হজ যাত্রা তো প্রত্যেক বছর হতে লাগল, কিন্তু হজ করতে এসে কেউ আর প্রকৃত অর্থে আল্লাহর উপাসনা করত না; বরং এই সময় সবাই আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত। সবাই মদ্যপান করত, নানা পাপ কাজ করত। নতুন-নতুন রীতি-নীতির জন্ম হল। এমনই এক রীতি ছিল, কাবার চারদিকে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিত, গান গাইত, সিস দিত। এই অধঃপতিত তীর্থযাত্রার নামে মক্কার লোকেদের কিন্তু খুব রোজগার হত। এখানকার অর্থনীতির ভিত ছিল দু'টো। এক. এই হজ যাত্রার সময়। দুই. পূর্ব (আফ্রিকা ও এশিয়া) ও পশ্চিমের (সিরিয়া ও সেই দেশ ছাড়িয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পর্যন্ত) মধ্যে বছরে দু'বার মাল চালানের

কারবার করার জন্য কাফেলাদের যাতায়াত করার সময়। অনেক ছদ্ম পুরোহিত এসে দেবমূর্তির পক্ষে কথা বলতে শুরু করেছিল। সেই সব দেবমূর্তির নামে অনেকে অনেক রকম নৈবেদ্য দিত এবং মানত করেও অনেকে অনেক জিনিস দিত। সেসবই নিয়ে যেত ওই পুরোহিতরা।

চার হাজার বছর ধরে আব্রাহামের সন্তানের (ইসমাইল) পর থেকে ওই সব চলেছিল। এরপর ইসমাইলের বহু প্রজন্ম পর একজনের জন্ম হল কুরেইশ নামে এক শক্তিশালী জনগোষ্ঠীতে। তাঁর নাম হজরত মহম্মদ। তাঁর জন্ম হয়েছিল 570 খ্রিস্টাব্দে। মহম্মদের জন্মের আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল; এবং তিনি যখন খুব ছোট, তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হল। তিনি যত বড় হতে থাকলেন, ততই তাঁর সমাজের লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন, তাঁর গুণগান করতে লাগলেন। বলতে গেলে তিনি খুব কম বয়সেই সবার থেকে একটা নাম পেলেন— 'সৎ'। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে একজন সম্পন্ন বিধবাকে বিবাহ করলেন। খাদিজার কাফেলা ব্যবসার দেখাশোনা করতেন মহম্মদ। মহম্মদের আচার-আচরণ খুব ভাল লাগত খাদিজার। মহম্মদের তুলনায় খদিজা পনেরো বছর বড় ছিলেন। কিন্তু, তাঁরা একসঙ্গে আটাশ বছর একগামী দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিলেন। এরপর খাদিজার মৃত্যু হয়।

প্রাক-ইসলামি (জাহিলিয়া, অর্থাৎ, অজ্ঞানতার কাল) আরবে হজরত মহম্মদ তাঁর সমাজের লোকেদের মতো মূর্তি পুজো করতেন না। সেই সময় মানুষ বহু অপকর্ম করত, সে সবই তখনকার দিনে চলত। মহম্মদ সে সবেও যুক্ত হতেন না। মক্কার কাছে পাহাড়ের চূড়ায় একটা গুহা ছিল। মহম্মদ সেখানে যেতেন। সেখানে গিয়ে তিনি আত্ম-চিন্তন ও ধ্যান করতেন। এ রকমই একদিন সেখানে যেতেই তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন ফেরেশতা জিব্রাইল। তিনি মহম্মদকে জানালেন যে, মহম্মদকে পয়গম্বরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, এমনটাই আল্লাহর আদেশ। এরপর তিনি পৃথিবীতে প্রথম বার কোরান প্রকাশ করলেন মহম্মদেরই সামনে। সেখানে বলা ছিল, "পড়ো! তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।... যিনি জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো। তোমার রব বড় মেহেরবান। তিনি কলম ব্যবহার করে জ্ঞানের কথা শিখিয়েছেন। মানুষকে এমনই জ্ঞানের কথা শিখিয়েছেন, যা মানুষ জানত না।" (96:1-5) এই ঘটনা ঘটেছিল রমজান মাসে, এবং সে ছিল পবিত্র রজনী (আরবি ভাষায় যাকে বলে লাইলাতুল কদর)। মহম্মদ সেই রাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে-ছুটতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে শান্ত করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "খাদিজার আত্মায় যিনি অবস্থিত, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আপনি একদিন এই জাতির পয়গম্বর হবেন। আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। মেহমানদারি করেন। কেউ অভাবে পড়লে আপনি তাকে সাহায্য করেন। সদা সত্য কথা

বলেন। আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন না।"

মহম্মদের পয়গম্বর জীবনে সেই ফেরেশতা বারে-বারে এসেছেন। মহম্মদ যে-দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনি নিজের জাতির মানুষকে বিশুদ্ধ আব্রাহামীয় একেশ্বরবাদের পথে ফিরিয়ে এনে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু আশঙ্কা তখনও ছিল। কেননা, মক্কার ধনী ও শক্তিশালী লোকেদের সঙ্গে পৌত্তলিক পুরোহিতদের জোট বহাল তবিয়তে ছিল সেই সময়। তারা মনে প্রাণে চাইত, এতদিন ধরে যা চলে আসছিল, তা-ই চলতে থাকুক। তেরো বছর ধরে মহম্মদ ও তাঁর অনুসরণকারীদের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা তাঁদের ঘাঁটি মদিনাতে চলে যান, এবং সেখানে (কোরানের) অনুমতিতে আত্মরক্ষা করে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেন। অবশেষে, মহম্মদের সৈন্য মক্কা জয় করেন, এবং এ-ও ঘোষণা করেন যে, যারা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। মহম্মদের সৈন্য মক্কার সব মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন। আব্রাহামের কাবাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে মূল আব্রাহামীয় ধর্মকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তার পর থেকে হজ যাত্রা ফের হতে লাগল বছরের নির্দিষ্ট এক সময়ে, এবং ইসলামের এই পঞ্চম স্তম্ভকে সেই সব মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হল, যাঁরা হজ যাত্রার করার জন্য শারীরিক ও আর্থিক ভাবে সক্ষম।

উপরে বিস্তারিত ভাবে যেসব তথ্য উল্লেখ করা হল, সেগুলো বহু লোকই জানেন। তবুও, কোনো-কোনো বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত এমন মন্তব্য করেন যে, হজ হল "একটা পৌত্তলিক প্রথা, যা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।" এসব কথা শুনে একজন মুসলমানের কি খারাপ লাগবে না?

হজ যাত্রার সময়টা আসে চান্দ্র বর্ষের দ্বাদশ মাসে। এই মাসকে হজের মাস (জ্বিলহজ্জ) বলা হয়ে থাকে। আব্রাহামের সময় যখন ইসলামের সূচনা, সেই তখন থেকেই এটা সবার কাছে পরিচিত। হজের সময় মহিলারা খুবই সাধারণ পোশাক পরেন। হাত ও মুখ ছাড়া সারা শরীর সেই কাপড়ে ঢাকা থাকে। পুরুষদের পরতে হয় সাদা ও সেলাই না-থাকা দু'টি বসন। এ ছাড়া শরীরে অন্য কোনো পোশাক থাকে না। শুধু একটা চটি এবং পকেট থাকা বেল্ট পরতে পারেন। এ হল এক সর্বজনীন পোশাক। সমস্ত তীর্থযাত্রীকে একই রকম দেখতে লাগে। সেখানে কার কী জাত চেনা যায় না। সেখানে সবাই সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন ভাবে সম্ভব হয় সবাই পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। সেখানে সমস্ত ভাষা, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, শিক্ষা ইত্যাদির ভেদাভেদ মুছে যায়। হজের সময় মানুষের শুধু ভাল দিকগুলো দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেই স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়

মানুষের সেই পবিত্র বিশ্বাস যে, সমগ্র মানবজাতিই হল একটি মাত্র পরিবার, সবাই একজন আল্লাহরই ইবাদাত করে। সেখানে কোনো বিভাজন নেই। সেখানে সব পরিবার ও সব গোষ্ঠীর মানুষ একে অপরের সঙ্গে একজোট হয়ে থাকার চেষ্টা করে। তাই তো লাখ-লাখ মানুষের মধ্যেও কেউ হারিয়ে যায় না।

হজ যাত্রার রীতি-নীতির মধ্যে রয়েছে আব্রাহামের মসজিদে ইবাদাত করা এবং কাবার চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। সাফা ও মারওয়া— এই দুই ছোট পাহাড়ের মধ্যে বেশ কয়েক বার যাতায়াত করা হয়। এখানেই পয়গম্বর ইসমাইল যখন ছোট ছিলেন, তখন তাঁর মা হগর তাঁর জন্য জল খুঁজতে গিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছিলেন। আরাফত পর্বতের চারিদিকে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা এবং মিনতি করা। তিনটি জায়গাতেই থাম বসানো আছে, সেই থামগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পাথর ছুড়ে মারা। এখানেই শয়তান আব্রাহামকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, যাতে আব্রাহাম আল্লাহর আদেশ মেনে নিজের সন্তানকে হত্যা না-করে। তাই ওই থামগুলো শয়তানের প্রলোভনকে জয় করার প্রতীক হিসাবে বসানো আছে। হজের মুখ্য বিষয় হল, ঈদ অল আযাহা বা ইদুজ্জোহা (ত্যাগের উৎসব) উপলক্ষে সম্মিলিত ভাবে ইবাদত ও খুতবা করা। এটা করা হয় আব্রাহামীয় পরম্পরা মেনে। যেসব মুসলমান হজ যাত্রায় যান না, তাঁরা এই ঈদ পালন করেন, একত্রিত হয়ে ইবাদত (সঙ্গে খুতবা) করে, এবং ভেড়া কোরবানি করে।

ঈদ হল এক আনন্দের উৎসব। সবাই এর আনন্দে মেতে ওঠে। মক্কার কাছে হজে অজস্র পশুর কোরবানি হয়। কিন্তু অত মাংস সেখানেই ও সেই সময়েই খাওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য সৌদি আরব প্রশাসন সেখানে একটি মাংস প্যাকেজিং ইউনিট স্থাপন করেছে (ফতোয়া বা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় মত গ্রহণ করার পর)। যাতে সেই মাংসগুলোকে বহু দিন পর্যন্ত সতেজ রেখে, পরে রয়ে-সয়ে সেই মাংসগুলোকে ইসলামি দেশগুলোতে পাঠানো যেতে পারে। সেই দেশগুলোতে পাঠানোর উদ্দেশ্য, সেখানকার গরিব-দুঃখীদের মধ্যে সেই মাংস বিলিয়ে দেওয়া। খুবই কম সময় ও পরিসরের মধ্যে সৌদি প্রশাসন যে ভাবে হজ যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করে, যাত্রীদের গতিবিধিকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করে, তা সত্যিই তারিফের যোগ্য।

ইসলামি নৈতিকতা

ইসলামি নৈতিকতার তুলনা করা চলে খ্রিস্টীয় ও ইহুদি নৈতিকতার সঙ্গে। যার বিশুদ্ধ রূপ নির্ধারণ করা আছে তোরা ও ইনজিল-এ। সেখানে পরবর্তী কালের সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর কোনো আদর্শের কথা নেই। এই গোষ্ঠী আব্রাহমীয় নৈতিক ঐতিহ্যের অনেক ক্ষতি করেছে। নৈতিক বিধিকে তারা এমন ভাবে পালটে দিয়েছে যে, কাল যা ছিল অনৈতিকতা, আজ তা-ই হয়ে উঠেছিল নৈতিকতা। এই অনৈতিকতাগুলোতে নিরীহ ও সুভাষিত ভাষার প্রলেপ লাগানো হয়েছে। যেমন, 'প্রেম', 'আমোদ', 'অন্তরঙ্গতা', 'প্রেমিক/প্রেমিকা', 'বঁধু'। সংশোধনবাদীরা আসলে ভেবেছিল, এই সব সুন্দর-সুন্দর ভাষা দিয়ে পুরনো পাপকে ঢেকে রাখা যাবে (বা সেগুলোকে প্রচার করা যাবে)।

আমাদের মনে হয়েছে, আলাদা-আলাদা করে সমস্ত বিষয় আলোচনা করার বদলে, এই বিভাগে আমরা কোরান ও পয়গম্বর মহম্মদের হাদিস (বাণী)-র বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে পাঠকের সামনে ইসলামি নৈতিকতার উৎসকে সরাসরি তুলে ধরা হলেই বেশি ভাল হয়। পশ্চিমী দুনিয়ার পাঠকদের সামনে বলতে গেলে কোনো তথ্যই নেই। তার উপর আবার, তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একের পর এক নেতিবাচক মত তুলে ধরে পাঠকদের তথ্যের থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আমরা বহু কাগজে-পত্রে পড়েছি, এবং রেডিও-টিভিতে শুনেছি ও দেখেছি যে, কোরান নাকি মুসলমানদের বলে মিথ্যে কথা বলতে, অন্যের সঙ্গে প্রতারণা করতে বা অ-মুসলমানদের হত্যা করতে; মহম্মদ নাকি নির্মম খলনায়ক ছিলেন, তিনি নিজেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মত্ত ছিলেন, তিনি কামনা-বাসনায় মগ্ন থাকতেন। আমরা এই সব মিথ্যাচারের বিরোধিতা করার চেষ্টা করি। কখনো-কখনো আমরা নিজেদের কথা কাগজে-পত্রে প্রকাশ করতে পারি। কখনো-বা কেউ নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনাও করেন। তবু ভুলভাল তথ্যের স্রোত বইতেই থাকে। তবুও আমরা নানা রকমের উদ্যোগ নিয়ে চলেছি। এসবের ফলে একের পর এক বহু মানুষই ইসলাম সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য জানতে পারছেন। আমূল পরিবর্তনের পক্ষে না-থাকা মানুষ যখন বুঝতে পারবেন, কোনটা ঠিক ও কোনটা ভুল,

তখনই এইসব বিদ্বেষপূর্ণ ও বাঁধাধরা মনোভাব প্রচার বন্ধ হবে। এই ধরনের প্রচার চালিয়েই আসলে অনেকে করে-কম্মে খায়।

ইসলামি নৈতিকতা মানেই শুধু কিছু করণীয় ও অকরণীয় কাজের তালিকা নয়। এই ধর্মের লক্ষ্য হল এমন মানুষ গড়ে তোলা, যারা বুঝবে ও মেনে নেবে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার ব্যাপারে মানুষকে কী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই তো মানুষ স্রষ্টা (আল্লাহ)-র নির্দেশ মেনে নিজের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে চাইবে। নীচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। এগুলোকে কোনো ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি; বরং যখন যেটা মনে পড়েছে, তখন সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরানের স্পর্শ

1. আর আল্লার বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সেলাম!' আর যারা তাদের প্রভুর জন্য ভক্তিতে দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। আর যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের রোষ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই এর রোষ হল অবিচ্ছিন্ন। নিশ্চয়ই সেটা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যেসব প্রাণী হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে ক্রোধানলে পুড়বে। কেয়ামতের দিন তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যে অনুশোচনা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে অনুশোচনা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয় সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন তারা সম্মানে চলে যায়। আর যারা তাদের প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় তারা অন্ধ ও বধিরদের মতো পড়ে থাকে না। আর যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদের

ন্যায়পরায়ণতার নেতা বানিয়ে দিন।' (25:63-74)

2. আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া ও একটি বাগানের দিকে যার পরিধি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমান, প্রস্তুত করা হয়েছে ন্যায়পরায়ণদের জন্য। যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে বা নিজেদের প্রতি অন্যায় করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে তাদের অপরাধ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বারবার করে না। (3:133-136)

3. আর স্মরণ করো, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিও না, কেননা প্রার্থনা হল সবচেয়ে বড় খারাপ কাজ" আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি।

   তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছর বয়সে, সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার আশীর্বাদ আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে প্রার্থনা করতে জোর করার চেষ্টা করে, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ করো তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমার প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। 'হে আমার প্রিয় বৎস, নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সর্ষে দানার মতো পরিমাণ হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানে বা মাটির মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধরো। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ো না। আর পৃথিবীতে দম্ভ ভরে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, তোমার আওয়াজ নিচু করো, নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।' (31:13-19)

4. আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন

এরকম প্রতিজ্ঞা না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের (এমনকি যারা তাদের প্রতি অন্যায় করেছে), যাদের দরকার এবং যারা আল্লাহর কারণে ঘর ছেড়েছে তাদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা পবিত্র নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও পরলোকে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (24:22-23)

5. ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে, বরং ভালো কাজ হল যে ইমান আনেন আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করেন তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়দের, এতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে যে সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং যারা অস্বীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এংব তারাই ও পবিত্র। (2:177)

6. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনায়বনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (33:35)

7. নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। আর তোমার যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।

তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, তোমরা যা করো। (16:90-91)

8. আর তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো

ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধ্যকে উপনীত হন, তবে তাঁদের 'উফ্' বলো না এবং তাঁদের ধমক দিও না। আর তাঁদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাঁদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার প্রভু, তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। (17:23-24)

9. যাদের সঙ্গে তোমরা শত্রুতা করছ, আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পয়ারণদের ভালোবাসেন। (60:7-8)

10. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা ধার্মিককে নিকটতর ও আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (5:8)

11. হে ইমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ইমানের পর মন্দ নাম কতই-না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরকে সন্দেহ করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (49:11-12)

12. আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে

পড়ো, আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করো, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (8:61)

13. আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করো তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (41:34)

14. যিনি খিদেয় তাদের আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন, তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সেই এতিমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর দরিদ্রকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। অতএব সেই প্রার্থনা আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের প্রার্থনায় অমনোযাগী, যার লোক দেখানোর জন্য তা করে। (107:1-7)

15. ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের মেপে দেয় অথবাওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে? (83:1-6)

পয়গম্বরের বাণী

1. কেউ নিজের জন্য যা কামনা করে, তা নিজের ভাইয়ের জন্যও কামনা না-করা পর্যন্ত, তোমরা কেউ-ই (আসলে) কাউকে বিশ্বাস করো না।

2. যদি কেউ নিজের চোখের সামনে কোনো খারাপ কাজ হতে দেখো, তাহলে তা থামানোর জন্য হাত লাগাও, যদি তা না-পারো, তাহলে সরব হও, যদি তা-ও করতে না-পারো, তাহলে মনে-মনে কামনা করো, তা যেন না-হয়। মনে-মনে কামনা করাটাই হল সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

3. মহামহিম রব (আল্লাহ) বলেছেন, "হে আদম-পুত্র, তুমি যদি আমার ইবাদাত করে, তোমার কোনো কাজের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আমি কিছু মনে করব না। হে আদম-পুত্র, তোমার পাপ জমতে-জমতে যদি আকাশের মেঘকেও ছুঁয়ে ফেলে, তখনও

যদি তুমি আমার থেকে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব। হে আদম-পুত্র, তোমার পাপে যদি পুরো পৃথিবী ভরে যায়, তা-ও যদি তুমি আমার কাছে আসো (সত্যিকারের অনুতাপ নিয়ে), এবং যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা না-করো, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। সেই ক্ষমায় সারা পৃথিবী ভরে যাবে।"

4. আল্লাহ তোমার রূপ ও শরীর দেখে না, তিনি দেখেন তোমার মন ও তোমার কর্ম।

5. সব মানুষই চিরুনির দাঁতের মতো সমান। তোমরা সবাই আদমের বংশধর। আদমের উদ্ভব হয়েছিল ধুলো থেকে। কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গরা মহৎ নয়, আরবরাও অন-আরবের চেয়ে মহৎ নয়। মহৎ শুধু ধার্মিকতা।

6. যে কুস্তি লড়তে পারে, সে মোটেও শক্তিশালী নয়। শক্তিশালী সে, যে রেগে গেলেও নিজেকে বশে রাখতে পারে।

7. পয়গম্বরকে এক তরুণ জিজ্ঞাসা করেছিল, "কার প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি সদয় হওয়া উচিত?" পয়গম্বর বললেন, "তোমার মায়ের প্রতি।" লোকটি তারপর জিজ্ঞাসা করল, "মায়ের পর কার প্রতি সবচেয়ে বেশি সদয় থাকব?" পয়গম্বর ফের বললেন, "তোমার মায়ের প্রতি।" লোকটি ফের জিজ্ঞাসা করল, "তার পর?" পয়গম্বর আবারও বললেন, "মায়ের প্রতি।" লোকটি আরও একবার জিজ্ঞাসা করল, "তার পর কার প্রতি?" এবার পয়গম্বর বললেন, "তোমার পিতার প্রতি।"

8. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করো, তারাই সবচেয়ে ভাল। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল আমি।

9. পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "একজন ধার্মিক কি কখনো ভীরু হতে পারে?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হয়তো হতে পারে।" এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, "একজন ধার্মিক কি কৃপণ হতে পারে?" এর উত্তরে তিনি বললেন, "হয়তো হতে পারে।" এরপর জিজ্ঞাসা করা হল, "একজন ধার্মিক কি মিথ্যাবাদী হতে পারে?" এর উত্তরে পয়গম্বর বললেন, "না, কক্ষনো না!"

10. প্রচণ্ড এক গরমের দিনে একজনের চোখে পড়ল যে, একটা কুকুর জলতেষ্টা মেটানোর জন্য একটা কুয়োর একেবারে কিনারে গিয়ে পৌঁছেছে, কিন্তু জলের নাগাল কিছুতেই পাচ্ছে

না। লোকটা তখন মনে-মনে ভাবল, "আমি যেভাবে জল তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছি, কুকুরটাও মনে হয় সেভাবেই কষ্ট পাচ্ছে।" লোকটা তখন কুয়োর কাছে গিয়ে নিজের জুতোয় জল ভরে নিয়ে এসে কুকুরটাকে সেই জল খেতে দিল। তা দেখে আল্লাহ তাঁর উপর প্রীত হলেন। তখন তিনি সেই লোকটির সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন।

11. ভণ্ডদের তিনটে লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তারা যখন কথা বলে, তখন মিথ্যে কথা বলে। তারা যদি কথা দেয়, তাহলে সেটা রাখে না। তার উপর যখন বিশ্বাস করা হয়, তখন সে ওই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে না।

12. মহামহিম রব (আল্লাহ) বলেন, "আমার সেবক যখন আমার এক বিঘত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে চলে যাই। সে যখন আমার এক হাত কাছে আসে, আমি তখন তার একেবারে বুকের কাছে চলে যাই। সে যখন আমার কাছে হাঁটতে-হাঁটতে আসে, আমি তখন তার কাছে ছুটে চলে যাই।"

13. ফেরেশতা জিব্রাইল আমাকে বারে-বারে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ না-পর্যন্ত আমার মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, আল্লাহ আমার পড়শিকে উত্তরাধিকারী করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কাজ হবে সেই পড়শির সেবা-যত্ন করা।

14. কেয়ামত যেদিন আসবে, সেদিন এই ডাক শোনা যাবে, "যারা মানুষকে ক্ষমা করে, তারা কোথায়? তোমরা তোমাদের রবের কাছে এগিয়ে আসো, তাঁর হাত থেকে তোমাদের পুরস্কার নিয়ে যাও। যারা ক্ষমা করে, তাদের প্রত্যেককেই বেহেস্তে ঢুকতে দেওয়া হয়।"

15. হে আল্লাহ! আমাকে দোষ-ত্রুটি ও দুঃখ-পরিতাপ থেকে মুক্ত করে তোমার মাঝে আশ্রয় দাও। আমাকে ভীরুতা ও নীচতা থেকে মুক্ত করে, তোমার মাঝে আশ্রয় দাও। আমাকে ঋণ ও অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করে তোমার মাঝে আশ্রয় দাও।

16. মানুষ মানুষকে যখন ঘৃণা করে, যখন সেসব কথা প্রচার করে বেড়ায় এবং সেই ঘৃণা আরও বেশি করে ছড়াতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তাদের এমন এক রোগ দিয়ে দেয়, যে-রোগ তাদের পূর্বপুরুষেরও অজানা।

17. সমস্ত পাপের মূলে আছে মদ।

18. ধার্মিকদের সব কাজই বড় বিচিত্র। কারণ তারা যা-ই করে,

তাতেই তাদের ভাল হয়। তারা যদি ভাল কিছু পায়, তাহলে তারা (আল্লাহর প্রতি) কৃতজ্ঞ থাকে।, এতে তাদের মঙ্গল হয়। তারা যখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে, তখন তারা ধৈর্য ধরে থাকে। এতেও তাদের মঙ্গল হয়।

19. যখন আদমের কোনো সন্তানের মৃত্যু হয়, তখন সে পরলোকে সম্পূর্ণ (ইহলোক থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু তিনটি জিনিস তার সঙ্গে থাকে (সে সবের সুফল সে পেতেই থাকে): অবিরাম দান-ধ্যান; উপযুক্ত জ্ঞান যে, সবাই এর থেকে অনবরত লাভবান হতে থাকবে; এবং এমন এক ধর্মনিষ্ঠ সন্তান, যে-সর্বদা তার পরলোকগত পিতার জন্য প্রার্থনা করে।

20. আল্লাহ যা-যা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে অপছন্দের কাজ হল এই যে, তিনি তালাককে আইনসিদ্ধ করেছেন। একজন ধার্মিক যেন কখনই (একান্তই যদি সম্ভব হয়) তার বিশ্বস্ত স্ত্রীকে ত্যাগ না-করে। স্ত্রীর যদি কোনো জিনিস তার ভাল না-লাগে, তাহলে স্ত্রীর নিশ্চয় এমনও কোনো দিক আছে, যা তার ভাল লাগে।

21. কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়াতলে মাত্র সাতজন আশ্রয় পায়। ওই সময় আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকে না। ওই সাতজন হল: ন্যায়পরায়ণ নেতা; এক তরুণ, যে আল্লাহর আনুগত্য করে বড় হয়েছে; একজন লোক, যার মন সর্বদা মসজিদের প্রতি নিবেদিত; দুই ভাই (বা বোন) যাদের ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর প্রতি নিবেদিত; একজন লোক, যে একান্তে আল্লাহর নাম নেয় এবং চোখের জলে ভেসে যায়; এক তরুণ, যাকে এক মহিলা প্রলুব্ধ করতে চাওয়াতে সে বলেছিল, "আল্লাহর প্রতি আমার ভয়-ডর আছে।" ; এবং একজন লোক, যে এমন ভাবে চুপচাপ দান-ধ্যান করে যায় যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করছে।

22. পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে কেউ যেন মসজিদের জামাতি নমাজে না-আসে (পাছে সে উগ্র গন্ধে সবাইকে বিরক্ত করে ফেলে)।

23. একদল (একনিষ্ঠ ভাবে) আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, আরেক দল মেনে চলে না। এই দুই দলকে এমন দুই দল যাত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, যাদের একদল জাহাজের উপরের তলায় থাকে, আরেক থাকে নীচের তলায়। নীচের তলায় থাকা যাত্রীদের জল খেতে হলে উপরে উঠতে হয়। তাই তারা বলে, "আমাদের নীচের তলায় একটা ফুটো করে দিলে ভাল হয়। তাহলে, সেই ফুটো দিয়ে জল ঢুকবে, আর আমরাও সহজে

সেই জল পেতে থাকব।" উপর তলার লোকেরা যদি নীচের তলার লোকেদের তা করতে দেয়, তাহলে সবাই একসঙ্গে ডুববে। কিন্তু যদি উপরের তলার লোকেরা নীচের লোকেদের তা করতে না-দেয়, তাহলে সবাই বেঁচে যাবে।

24. উপরে থাকা হাত (দাতার হাত) নীচে থাকা হাতের (দান নেওয়া হাত) চেয়ে ভাল হয়।

25. পয়গম্বর বলেছিলেন, "তোমার ভাইয়ের দোষ থাকুক বা না-থাকুক, সব সময় তার পাশে দাঁড়াবে।" তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ভাই যদি ঠিক পথে থাকে, তাহলে তার পাশে থাকা যে দরকার, তা তো আমরা বুঝলাম। কিন্তু, সে যদি ভুল পথে থাকে, তাহলে তার পাশে কী ভাবে থাকা যায়?" এর উত্তরে পয়গম্বর বলেছিলেন, "সে ভুল পথে গেলে, তাকে বাধা দিতে হবে। এ ভাবেই তার পাশে থাকার কথা বলেছি।"

26. তোমাদের আগে বহু জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেননা, অভিজাত লোকেদের ছেলেরা চুরি করলে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু, হীনবল মানুষের ছেলে চুরি করলে, তাকে শাস্তি দেওয়া হত।

27. ইহলোকে থেকে এমন ভাবে কাজ করো, যেন তুমি এখানে চিরকাল বেঁচে থাকবে। পরলোকে গিয়ে এমন ভাবে কাজ কোরো, যেন কাল-ই তোমার মৃত্যু হবে।

28. পয়গম্বরের কাছে কয়েক জন গরিব মুসলমান এসে এই অভিযোগ করল, "ধনীরাই সব ভাল কাজ করে, সেই সবের সুফল পেয়ে যায়। আমরাও ইবাদত করি, ওরাও করে। আমরাও রোজা রাখি, ওরাও রোজা রাখে। কিন্তু ওরা জাকাত করে, আমরা তা করতে পারি না।" পয়গম্বর তখন বললেন, "তোমরাও জাকাত করতে পারো, এমন কিছু কি আল্লাহ তোমাদের দেননি? ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও জাকাত। আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর, এই কথা বলাও জাকাত। ঠিক পথে চলা এবং ভুল পথ এড়িয়ে চলাও জাকাত। যখন তোমরা নিজদারগমন করবে, তা-ও জাকাত।" এ কথা শুনে সবাই জিজ্ঞাসা করল, "নিজের যৌন বাসনা চরিতার্থ করেও সুফল পাওয়া যায়?" পয়গম্বর তখন বললেন, "তোমাদের কি মনে হয় (না), কেউ যদি অনৈতিক ভাবে নিজের বাসনা চরিতার্থ করে, তাহলে তা পাপ? কিন্তু কেউ যদি নৈতিক পথে থেকে নিজের যৌন বাসনা চরিতার্থ করে, তাহলে তার সুফল তো অবশ্যই পাবে।"

29. পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহকে মেনে চলা শ্রেয় কেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তাঁকে মেনে চলতে এমন ভাবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। তুমি যদি তাঁকে দেখতে না-ও পাও, তবুও তিনি কিন্তু তোমাকে সব সময় দেখতে পাচ্ছেন।"

আল্লাহর প্রতি তোমার যদি মনোযোগ থাকে, তাহলে তুমি তাঁকে নিজের সামনেই দেখতে পাবে। নিজের সুদিনে আল্লাহকে মনে রেখো; দেখবে, তিনি তোমার দুর্দিনে তোমাকে দেখবেন। জেনে রেখো, যা তোমার পাশ দিয়ে যায়, তা তোমার উপর না-ও পড়তে পারে। আবার, তোমার উপর যা পড়েছে, তা হয়তো তোমার পাশ দিয়ে যায়ইনি। একটা কথা জেনো, ধৈর্য ধরে থাকলে জয় আসবেই, কষ্ট পেলে স্বস্তিও পাবে, এবং কঠোরতার মধ্য দিয়ে গেলেই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়
জ্বলন্ত সমস্যা

ইসলাম হল এক সর্বাঙ্গীণ ধর্ম। যা জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে কথা বলে। শুধুমাত্র নমাজ ও মসজিদ নিয়েই কথা বলে না। ইসলাম গোটা একটা সমাজ নিয়ে কথা বলে, যে-সমাজের অংশ হল মুসলমানেরা। স্বাভাবিক ভাবেই, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সবার সঙ্গে মিলে বের করার জন্য এবং কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার জন্য মুসলমানরা নিজেদের মত অন্যদেরও জানাতে চায়।

সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে মুসলমানরা কী ভাবে, সে-কথাই আমরা এই অধ্যায়ে তুলে ধরব। এখানে বিষয়গুলোকে শুধুমাত্র নমুনা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর সাহায্যেই আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটা তুলে ধরার প্রয়াস পাব যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি। এ ক্ষেত্রে আমরা তত্ত্ব ও বিমূর্ত ভাবনার পরিসর থেকে বেরিয়ে আসব।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে: (1) পৃথিবীর নতুন নিয়ম, (2) জেহাদ, (3) পরিবার ও যৌন বিবর্তন, (4) জৈব-চিকিৎসা নীতি, এবং সেই সঙ্গে (ক) প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়, (খ) অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন, (গ) মৃত্যুর সংজ্ঞা, (ঘ) বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু সঙ্ঘটন (ইউথেনেজিয়া) ও (ঙ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

নতুন পৃথিবীর নিয়ম

আচমকাই কমিউনিজমের পতন হল, এবং তার পর নতুন পৃথিবীর নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীতে অনেকেই আঁচ পাননি যে কমিউনিজমের পতন

হতে চলেছে। কিন্তু, বেশ কয়েক বছর ধরেই ইসলামি লেখাপত্রে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ, এই দুইয়েরই সমালোচনা করে আসা হয়েছে, এবং এই আশা করা হয়েছে যে, এই দু'টোই যেন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহু মুসলমান পণ্ডিতই তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামি শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা স্বতন্ত্র মতবাদের নিরিখে বিচার করলে, ওই দুই মতবাদের কোথায়-কোথায় খামতি ধরা পড়ে।

এখনই এই সিদ্ধান্তে আসার সময় হয়নি যে, কমিউনিজমের পতন হওয়া মানেই এই নয় যে, তার জায়গা দখল করার ব্যাপারে পুঁজিবাদই যোগ্য। দু'টি মতবাদেই ত্রুটি আছে। কেননা, এই দু'টিই হল জাগতিক আদর্শ। যে-প্রজাতির বৈশিষ্ট্য এই জাগতিকতার ঊর্ধ্বে, সেই প্রজাতির জন্য ওই দুই মতবাদ উপযুক্ত নয়। এই দু'টি মতবাদই মনে করে যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে-সংঘাত রয়েছে, তার নিরসন সম্ভব নয়। দু'টি মতবাদই বিপরীত অবস্থানে থেকে এই একই কথা মনে করলেও, তাদের ভাবনায় গলদ আছে। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিকে নস্যাৎ করতে চায় কমিউনিজম। কিন্তু বহু ব্যক্তির সমন্বয় ছাড়া সমাজ আর কী-ই বা? তাই কমিউনিজম যা চিন্তা করে, তা আদতে সমাজকেই নস্যাৎ করছে।

অন্যদিকে, পুঁজিবাদ শুধু ব্যক্তির সপক্ষে কথা বলে। ব্যক্তির উপর সমাজের যে-দাবি আছে, তার থেকে পুঁজিবাদ ব্যক্তিকে অহেতুক রক্ষা করতে থাকে। এর থেকেই ধীরে-ধীরে ব্যক্তির মনে স্বার্থপরতার ধারণা ন্যায্যতা পেতে থাকে। সেই ধারণারই যখন বহিঃপ্রকাশ হয়, তখন তা নানা রূপ ধারণ করে। যেমন: জাতিবাদ, কর্পোরেটবাদ, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, দাসত্ব ও ঔপনিবেশিকতা। পুঁজির একমাত্র কাজ এবং একমাত্র নিয়তি হল বাড়তে থাকা, এবং সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকা। এটাই হল পুঁজিবাদের মূল ভিত। স্থানীয় বাজারে ব্যাবসা করার জায়গা যখন আর থাকে না, তখন বিদেশের মানে তৃতীয় বিশ্বের বাজারের দিকে হাত বাড়ানো হয়। তাদের নিশ্চয় এদিকটা চোখে পড়ে না, বা হয়তো ইচ্ছে করেই তারা তা দেখতে চায় না যে, এই পৃথিবীর একটা সীমা আছে, সেখানে সীমাহীন বৃদ্ধি লাভ করাটা সম্ভব নয়।

টাকা, বেশি-বেশি টাকার পিছনে মানুষের উন্মাদের মতো ছুটছে। এর সঙ্গে আবার পরিকল্পিত ভাবে যোগ করে দেওয়া হয়েছে উপভোক্তাবাদ ও নিত্য-নতুন জিনিস বের কররা প্রবণতাকে। এগুলোকে পরিকল্পিত ভাবে উৎসাহিতও করা হচ্ছে। মানুষের চাহিদাকে পূরণ করার জন্য নিত্য নতুন জিনিস বের করা হচ্ছে না; বরং এর লক্ষ্য হল, আরও বেশি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা ভোগ করার ইচ্ছাকে পূরণ করা। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই অপূরণীয়। কিন্তু সেগুলোকে খুব দ্রুত গতিতে শেষ করা হচ্ছে। পার্থিব

সম্পদকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। এগুলোকে অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সম্পদগুলোকেই বিশেষ করে লুট করা হচ্ছে। এই দেশগুলোই হয়ে উঠেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এখানে খুব সস্তায় কাজের লোক পাওয়া যায়, এমনকী কাঁচামালও পাওয়া যায় সস্তায়। এই বাজারকে আরও বাড়নো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। একেবারে নামমাত্র দামে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল কেনা হচ্ছে, তারপর সস্তার কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মহার্ঘ সব জিনিসপত্র। সেগুলো এখানকার লোকেদেরই বিক্রি করা হচ্ছে। এইভাবে আসলে এখানকার মানুষদেরই বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখানকার লোকেদের কিন্তু সেইসব সম্পদ বা কাঁচামাল ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। যা করতে পারলে এখানকার মানুষ নিজেই নিজেদের ভাগ্য ফেরাত পারত। তাদের আর প্রথম বিশ্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না।

একেবারে অভাবে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের লোক যাতে মারা না-যায়, তার জন্য অনবরত পুঁজির জোগান দিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঋণ ও আর্থিক সাহায্যের রূপে। যাতে এখানকার লোকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়তে পারে, যাতে তা প্রকারান্তরে পশ্চিমী পুঁজিকেই মদত দিতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করার জন্য সেই সব আর্থিক সহায়তার খুব সামান্য অংশ খরচ করা হয়। সেই বিপুল অর্থের বেশির ভাগটাই চলে যায় দেশজ অভিজাতদের হাতে। এরাই ঠিক করে যে, দেশের শাসন ক্ষমতায় কারা বসবে; এরা আসলে নিজেদের অনুচর তৈরি করে। এই অনুচরবৃন্দই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। ঋণ ও আর্থিক সহায়তার নিয়ম ও শর্ত নিয়ে তারা জনসমক্ষে কোনও আলাপ-আলোচনা করতে চায় না। তারা এসব টাকার ব্যবস্থাপনা কীভাবে করবে, তা নিয়ে কাউকে নজরদারি করতে দেয় না। নিজেদের অব্যবস্থার জন্য যাতে তাদের দায়বদ্ধ থাকতে না-হয়, সেই ব্যবস্থাও করে রাখে তারা। শ্রমিকদের অধিকারকে তারা দাবিয়ে রাখে। শ্রমিক সুরক্ষার নীতিও খুব শিথিল করে রাখে। ভয়াবহ দুর্নীতি যাতে কেউ ফাঁস করতে না-পারে, সে-ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখে। এই দুর্নীতিই তৃতীয় বিশ্বের, এমনকী ইসলামি দুনিয়ারও বেশ কিছু দেশের এক বিশেষ লক্ষণ হয়ে উঠেছে। এখানে দু'টো বিরোধাভাস লক্ষ করা যেতে পারে। এক. মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশেই পশ্চিমী দুনিয়ার থেকে টাকার জোগান দেওয়া হয়। কিন্তু, যে-দেশে টাকার জোগান বেশি করে দেওয়া হয়, সেই দেশ আরও বেশি গরিব হয়ে যায়, আরও বেশি করে ঋণের চোরাবালিতে ঢুকে যেতে থাকে। দুই. মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রায় কাছাকাছি চলে যাওয়ার পরও দেখতে পাওয়া যায় যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরে সেসব দেশে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হলেও, সেই গণতন্ত্রকেই শেষ পর্যন্ত বুড়ো

আঙুল দেখানো হয়। গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলা লোকেরাই স্বৈরশাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশ্যাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তারা প্রয়োজনে স্বৈরশাসকদের সমর্থন করে, এমনকী সেনা নামাতেও পিছপা হয় না।

পশ্চিমী দুনিয়া মাথা খাটিয়ে যা-ই বের করে, তারই ঘোষিত লক্ষ্য হল স্থায়িত্ব। অর্থাৎ এমন এক সুযোগ সৃষ্টি করা, যার সাহায্যে বিদেশি পুঁজি খুব ভাল করে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। পারলে তারা বিদেশিদের উপরেও এই শোষণ চালায়। এইভাবে তারা ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে ঋণের পাহাড় জমতে থাকে। তখন তাদের জিএনপি-ও কোনও কাজে দেয় না, ঋণ শোধ করা তো দূরের কথা। এসব দিকের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা বেশ ভাল ভাবেই পরিচিত, এবং এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের হামেশাই হচ্ছে। এর পরিণতি তারা নিজেদের সংসারে ও পরিবারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। তারা এ-ও দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের সন্তানদের জন্য সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। তারা এটাকে অন্যায় বলে মনে করছে, এবং এই ব্যবস্থাকে তারা বদলাতে চাইছে। কিন্তু তাদের উপর নেমে আসছে ভয়ংকর দমন-পীড়ন। পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদরা এই দমন-পীড়নে মদত দিচ্ছেন। তাঁরা নিজেদের দেশের মানুষের সামনে নিজেদের কাজকে ন্যায্যতা প্রদানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই প্রোপাগান্ডা নিয়ে তাঁরা খুব দ্রুত কিছু সূত্র ও পরিভাষার জন্ম দিয়ে চলেছেন (তাঁরা যেসব প্রচার চালাচ্ছেন, সেগুলো হল: যারা আমাদের স্থায়িত্বকে নষ্ট করছে, যারা আমাদের দেশের স্বার্থে নির্লজ্জ ভাবে আঘাত হানছে, আমরা তাদের উপরেই দমন-পীড়ন চালাচ্ছি।)। যাঁরা ন্যায়ের দাবি জানাচ্ছেন, তাঁদের আবার এথদিন খুব সহজেই 'কমিউনিস্ট' বলে দেগে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু, কমিউনিজমের পতন হওয়ার পর থেকে, নতুন একটা নামে দেগে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সেই নামটা হল, 'ইসলামি মৌলবাদ'।

মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে তাকে সেই অনুযায়ী গড়ে তুলে চালনা করার জন্য বিপুলায়তন মিডিয়া হাউজ তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর মালিক হল বড়-বড় সব কর্পোরেট, সেগুলোতে ঢালা হয়েছে প্রচুর পুঁজি। এই মিডিয়া হাউজগুলো যে-টোপ ফেলেছিল, সেটা সহজেই গিলে ফেলেছে পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষ। এখন তারা নিজেদের নীতি-নির্ধারকদের সব কাজকেই কোনও রকম সন্দেহ না-করে, স্রেফ মেনে নিচ্ছে। পশ্চিমী দুনিয়ার লোকেদের সবচেয়ে বড় ভুল এটা নয় যে, তারা সন্দেহাতীত ভাবে সবকিছু মেনে নিচ্ছে। তাদের আরও একটা ভ্রান্তি আছে। তাদের একটা কথা জানতে খুবই দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, পুঁজির প্রতি থাকা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা এখন আর শুধু তৃতীয় বিশ্বের দূর-দূরান্তের আদিবাসী অঞ্চলগুলোকেই গিলে নিয়ে বসে নেই। এখন সরকার ও বড়-বড় ব্যবসায়ীদের কাছে পবিত্র জপের মন্ত্র হয়ে উঠেছে এই কথাগুলো: বিকাশ

আরও বিকাশ, পুঁজি আরও বেশি পুঁজি, টাকা আরও বেশি টাকা! এইসব মন্ত্র জপতে-জপতে সরকার ও ব্যবসায়ীরাও নিজেদের দেশেই নিজেদের লোকের উপরেই লোভের থাবা বসিয়ে চলেছে। এই কথা বোঝানোর জন্য, এর চেয়ে ভাল আর কী উদাহরণ থাকতে পারে যে, বড়-বড় শিল্পের বিপুল অংশই গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া সহ অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায়। কেননা সেই সব জায়গার শ্রমিকদের সস্তায় খাটিয়ে (আর্থিক ভাবে এবং মানবিক দিক দিয়ে) খুবই সস্তায় পণ্য তৈরি করা যায়। সেই পণ্যগুলোকেই যখন আমেরিকায় পাঠানো হবে, তখন কি সেগুলোকে সস্তায় বিক্রি করা হয়? এই প্রক্রিয়ায় লাখ-লাখ আমেরিকান কর্মীদের কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়। সেই কর্মীরাই তখন বাধ্য হয়ে নাম লেখান বেকারদের তালিকায়।

পুঁজিবাদের এই বেলাগাম যাত্রা অনন্ত কাল ধরে চলতে পারে না। কানাগলিতে ধাক্কা খাওয়ার দিন যে এর ঘনিয়ে এসেছে, তার বহু সাবুদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে নষ্ট করা হয়েছে, তোয়াক্কা করা হয়নি, এমনকী লুকিয়েও রাখা হয়েছে। কিন্তু সাবুদ তো সাবুদই। এগুলোকে কেউ পছন্দ করুক বা না-করুক, তাতে কী-ই বা এসে যায়। তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষ হল সোনার ডিম দেওয়া একজোড়া হাঁস। এই সম্পদ শীঘ্রই ফুরোবে, এবং মানুষও বেশি দিন থাকবে না। সময় হাত থেকে চলে যাওয়ার আগেই বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন আনতে হবে। তা না-হলে এই পৃথিবীটাই আর টিকে থাকতে পারবে না।

এখন শুধু নিয়ম বদল করলে হবে না। বদল আনতে হবে মানসিকতায়। মনের মধ্যে যদি বস্তুবাদ ভর করে থাকে, তাহলে আসল রোগের চিকিৎসা কখনই হবে না। শুধু উপসর্গেরই চিকিৎসা চলতে থাকবে। এইভাবে অনিবার্য পরিণতিকে কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যাবে মাত্র, পুরো আটকাতে পারা যাবে না। আমরা বনাম ওরা, উত্তর বনাম দক্ষিণ, শোষক বনাম শোষিত, ধনী বনাম গরিব, সাদা চমড়া বনাম কালো চামড়ার মানুষ, প্রভু বনাম গোলাম (বা ভৃত্য)— মানুষ যদি পরস্পরের সম্পর্কে এইসব ধারণা নিয়ে চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানবিকতার জাহাজ একদিন ডুবে যাবেই। ডিলাক্স ও ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের যাত্রীরা যতই মূল্যবান ও বিলাসী জিনিস কিনে জমিয়ে রাখুন না-কেন, এই জাহাজ ডুববেই ডুববে।

এই পৃথিবীর রাজনীতিবিদ ও ধনিক শ্রেণির কোনো দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আছে বলে সন্দেহ হয়। তারা নাটকীয় ভাবে আত্ম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে বলেও মনে হয় না। এটা দেখে খারাপই লাগে, তারা সেই একই অশুভ পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, এবং মানবজাতিকেও ক্রমশ অতল খাদের কিনারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র আশার আলো এই যে, সাধারণ মানুষকে সচেতন

করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এঁরাই সেই মানুষ, যাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, দিনের শেষে যাঁরা চূড়ান্ত রায় দেন। নতুন পথ খুঁজে বের করার দাবি যখন উঠবে, তখন রাজনীতিবিদদের কাছে দু'টো পথ খোলা থাকবে। হয় তাদের পরিবর্তনের পথে পা বাড়াতে হবে, আর নাহলে পরিবর্তনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু, এসব নিয়ে ইসলামের কী-ই বা করার আছে? ইসলামি পণ্ডিত ও চিন্তকরা (মিডিয়া কথিত সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী নয়। যা কিছু ইসলামি, তাকেই এই দুই নামে দেগে দেওয়া হয়) বহু দশক ধরেই এমন এখ ইসলামি তন্ত্রের রূপরেখা অঙ্কন করে চলেছেন যার সাহায্যে পৃথিবীর সমস্যাগুলোকে মেটানো হবে। এর ভিত হল ইসলামি শরিয়ত। যা অতি অবশ্যই সেই সব সূত্রের হুবহু নকল নয়, যেসব সূত্র আগেকার সময় ও পরিস্থিতিতে হয়তো কোনো কাজে লেগে গেছে। এই তন্ত্র একান্ত ভাবে ইসলামিও নয়। এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের কথা ভেবে তৈরি করা হয়নি। এটা তৈরি করা হয়েছে সমগ্র মানজাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে। সবাইকে নিয়েই তো ভাবতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এখানে সবার সঙ্গে মত বিনিময় করতে হবে। আমাদের সবারই নিয়তি তো একই। এই তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে বর্ণনা করা হল:

মানুষের উপর কর্তৃত্ব

মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্তা নয়; বরং মানুষকেই পরম সত্তা আল্লাহর প্রতি দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ থাকতে হবে! দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন, ঈশ্বর ছাড়া সবই সম্ভব, যে-কোনো জিনিসকেই ন্যায় ও যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। মানুষ যখন ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করে, তখন সে আত্ম-উপাসনের পর্যায়ে নেমে যায়। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত ভূমিকা হল, আল্লাহর হয়ে কাজ করে যাওয়া, আল্লাহর এই পৃথিবীর দেখাশোনা করা। স্রষ্টার নির্দেশ মেনে এই গ্রহকে পরিচালনা করার জন্য প্রকৃতিকে পূর্ণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে মানুষের হাতে। কিন্তু নিজের ইচ্ছা ও লোভকে চরিতার্থ করার জন্য এ-কাজ করার অধিকার মানুষের হাতে নেই। বিজ্ঞান (এর শৈশব এখনও কাটেনি) ও অজ্ঞতার (মারণ ফাঁদ) বশবর্তী হয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে ভুলে যাওয়াটা উচিত হয়নি মানুষের। হায়! মানুষের যদি যথেষ্ট জ্ঞান থাকত।

বস্তুর মালিকানা

আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। তাই সবকিছুর উপরেই একমাত্র তাঁরই মালিকানা থাকা উচিত। আমাদের মালিকানা তার পরে। সৎ পথে সম্পদের মালিক হওয়া,

এবং সম্পদ বৃদ্ধি করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। সত্যি বলতে কী, কে কত সম্পত্তির মালিক হবে, সে-ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু একটা কথাই মনে রাখতে হবে, পুঁজি শুধু অধিকারের বিষয় নয়, এর সঙ্গে কর্তব্যও জড়িয়ে আছে। পুঁজির কাজ শুধু সীমাহীন ভাবে বেড়ে চলা নয়; বরং তাকে সমাজের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হবে।

এমন একটা ধারণা আছে, (কমিউনিজম ও পুঁজিবাদে) ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে অনিবার্য সংঘাত। ইসলামে কিন্তু এমন ধারণার অস্তিত্ব নেই। ইসলাম বরং সমতার কথা বলে। এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম এক ভারসাম্য রক্ষা করে সবার জন্য ন্যায়ের কথা বলে। এই ভারসাম্যকে শুধুমাত্র আইনের কঠোর হাত দিয়ে রক্ষা করা যায় না। এর জন্য চাই, আল্লাহর মন জয় করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই ভাবেই দানের মধ্য দিয়ে দাতা, অনবরত আনন্দের উৎস খুঁজে পান। আল্লাহ সর্বদা সমতায় অবস্থান করেন। তিনি জীবন্ত বাস্তব। কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ধারণাকে অবান্তর বলা হবে, এই ধারণাকে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে করা হবে।

ইসলাম মনে করে, আল্লাহর নিদান এই যে, ধনীর সম্পদেই হবে গরিবের ভরণ-পোষণ। কিন্তু পৃথিবীর নতুন নিয়মে এই নীতি মেনে চলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক অনুপাতে। নতুন নিয়ম অবশ্যই বাস্তবায়িত ও সফল হতে পারে। কিন্তু মূল্যবোধহীন শিক্ষা ব্যবস্থায়, সংবাদ মাধ্যমের মতামতের জোয়ারে, বা অন্যায়ের প্রতি সহনশীল সমাজে তা সম্ভব নয়। সমাজ এখন এতটাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও সংহত হয়ে উঠেছে। তাই এখন আৎ কেউ একা-একা বেঁচে থাকতে পারবে না। যে সম্পদের পাহাড় বানিয়ে তার চূড়ায় বসে আছে সে-ও পারবে না, এবং যে দারিদ্রের অতল গহ্বরে পড়ে আছে, সে-ও পারবে না।

চোদ্দশো বছরেরও আগে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর এই নিয়ম জারি করেছিলেন যে, কেউ যদি অভাবের তাড়নায় মারা যায়, তা হলে শহরের সবাইকে জরিমানা দিতে হবে। কেননা, তখন ধরা হবে যে, তাঁদের জন্যই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পয়গম্বর বলেছিলেন, "সমাজ হল একটা শরীরের মতো, এর একটা অঙ্গ যখন কষ্ট পায়, তখন তাকে ঠিক করার জন্য এগিয়ে আসে অন্যান্য অঙ্গগুলো।" প্রত্যেক নাগরিকেরই ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার অধিকার আছে (শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য বাঁচলে চলবে না)। অন্যের দান নিয়ে বেঁচে থাকা উচিত নয় বলে, একজন ব্যক্তির সবেতন কর্ম সংস্থান পাওয়ার অধিকার আছে। সেজন্য শ্রমিক যেখানে কম পাওয়া যায়, একমাত্র সেখানেই কম শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে পারার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। কর্ম সংস্থানের সুযোগকে সীমিত করার জন্য বা শ্রমিকদের বেকার করে দেওয়ার

জন্য যাতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার না-হয়। যন্ত্রের উপরে মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে। ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর যৌথ কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আইনে। এর মানে এই নয় যে, প্রযুক্তির অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যে-কোনও সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তিকে শ্রমিকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। কর্মীরা যে-কোম্পানিতে কাজ করেন, সেই কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য তাঁদের উৎসাহিত ও সমর্থন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে থাকা মেরুকরণকে মুছে ফেলা, এবং কর্মীরা যাতে কোম্পানির উন্নতির স্বার্থে কাজ করার প্রেরণা পান।

ইসলামের আরও একটা নিয়ম হল, টাকাকে উৎপাদনশীল কোনো কাজে লাগানো ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যাতে বাড়ানো না-হয়। সে জন্য, ইসলামে সুদের কারবার বেআইনি। গত কয়েক দশকে, সুদহীন ব্যাঙ্কিং নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। তাই শুধু ইসলামি দেশগুলোতেই নয়, ইউরোপ ও আমেরিকারও নানা দেশে সফল ভাবে এই নীতি প্রয়োগ করে এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে উঠেছে।

মানুষের সমতা

সব মানুষই এক। সবাই একই পরিবারের সদস্য। কেননা, সবাই আদিপিতা আদম ও আদিমাতা ইভের বংশধর। এই দিকটার উপর জোর দিতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই এই কথা শেখাতে হবে। সেই সঙ্গে মানুষের সহজাত সমতা সম্পর্কিত ধারণাও দিতে হবে তাদের। সাদা চামড়ার মানুষরা (বা আর্য) স্বাভাবিক ভাবেই অন্য মানুষের চেয়ে উপরে। এই মিথ্যে ধারণাকে প্রমাণ করার জন্য এক সময় ইউরোপে (এবং আমেরিকায়) বিজ্ঞান ও ধর্ম, এই দুয়েরই অপব্যবহার করা হয়েছে। এটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যের কথা। মিথ্যে ধারণাটাকে প্রমাণ করার জন্য যে ভুয়ো সাক্ষ্য সাবুদ জড়ো করা হয়েছিল, সেগুলো এখন অকেজো হয়ে গেছে, কালের অতল তলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই ধারণা মেনে চলার পরম্পরা শেষ হয়ে যায়নি। এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ গির্জাতেই যিশুর যে-ছবি বা মূর্তি থাকে, তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে, যিশুর চুল সোনালি, গায়ের রং ফর্সা, এবং চোখের মণি নীল রঙের। কিন্তু প্যালেস্তাইনের মানুষের গায়ের রং তো সাধারণত কালো হয় বা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের হয়।

পাশ্চাত্যে বর্ণবাদের সাক্ষ্য বলতে গেলে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। এই অবস্থার বদল ঘটানোর সদিচ্ছা বলতে গেলে এখনও সঠিক মাত্রায় জেগে ওঠেনি। আমেরিকায় নাগরিক অধিকার রক্ষার কঠিন লড়াই বহু দশক ধরে চলছে। এই ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও, এ

কথা বলা যায় না যে, দাসত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মুছে গেছে। আইন-কানুন তৈরি করে সমতা আনা যায় না। এটা পুরোপুরি মন-মানসিকতার ব্যাপার।

সাদা চামড়ার মানুষদের সভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় হল দাস প্রথা। কিন্তু এর জন্য আজ পর্যন্ত আমেরিকার কোনো কালো চামড়ার মানুষের কাছে সাদা চামড়ার মানুষ 'ক্ষমা' চায়নি (কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অশ্বেতাঙ্গ জাপানি আমেরিকানরা রাজনৈতিক বন্দি হয়ে ছিলেন বলে, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে, এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে)। বর্ণবাদী সংঘাত আজও লেগে আছে। এগুলো সত্যিই খুব পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এসব হিংসাত্মক ঘটনায় যারা যুক্ত থাকে, তারা সব সময় নিজেদের কৃতকর্মকে ন্যায্যাতা দিতে থাকে। এ প্রসঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেসে অদূর অতীতে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার[১৪] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা উন্নত করার জন্য সব সময়েই আওয়াজ উঠতেই থাকে। তার ফলে কিছু কাজ হয়, ক্ষণিকের জন্য সুরাহা পাওয়া যায়। কিন্তু কাজ যতই হোক না-কেন, সমস্যার মূল কারণটা বলতে গেলে অধরাই থেকে যায়। অস্ত্র বা অর্থ দিয়ে স্থায়ী ও প্রকৃত সমাধান আনা সম্ভব নয়। যখন সবাই নিজের অন্তরে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করবে যে, প্রত্যেক মানুষই আপন জন এবং সবাই সমান; সবাই যখন একে অপরকে ভাই বা বোন বলে মনে করবে; একমাত্র তখনই আসবে প্রকৃত পরিবর্তন। আইন দিয়ে এ কাজ হওয়ার নয়। এর জন্য দরকার শিক্ষা। দুনিয়া বদল করতে হলে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে। যার উদ্দেশ্য হবে, ঐক্যবদ্ধ ও সহানুভূতিশীল এক সমাজ গড়ে তোলা। যেখানে কোনো ধরনের বিভাজন থাকবে না। সাম্য-মৈত্রী-ঐক্যের জয়গানকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করে নতুন এক তাৎপর্য দান করতে হবে। এটা শুধু কোনো দেশের গণ্ডির মধ্যে করলে হবে না, এটা করতে হবে সারা পৃথিবীতে।

পরিবর্তন আনার জন্য নব্য-ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে পুনরায় শিক্ষিত করতে হবে। সেই সঙ্গে এই দেশগুলোর কাজ হবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য প্রকৃত অর্থে প্রয়াস পাওয়া। এমন একটা অনুমান করা হয়েছে যে, ইউরোপের দেশগুলো তাদের কৃষকদের যে-পরিমাণ ভর্তুকি দেয়, তা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে বেশ বড়সড় বদল এনে, সারা পৃথিবীতে অনাহারের সমস্যাকে দূর করা যেতে পারে। কিন্তু, ইউরোপে আয়োজিত বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীদের (জনসেবামূলক) বৈঠকে এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে, সেটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভর্তুকিতে কাটছাঁট করা বা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন— এই দুয়ের মধ্যে কোনো বিকল্পকেই উপযুক্ত বলে

বিবেচনা করা হয়নি। প্রথম বিকল্পটা মানা হয়নি রাজনৈতিক সাধ্যের কথা ভেবে। দ্বিতীয় বিকল্পটা মানা হয়নি রাজনৈতিক কৌশলের জন্য।

আত্ম-সংযমের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের এক অনন্য গুণ হল আত্ম-সংযম। কিন্তু এটাকে আর কাজে লাগানো হচ্ছে না। খুব দ্রুত এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একে ফের জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যকে নিশ্চিত করে এই গুণ। কিন্তু, আধুনিক যুগের মানুষ যেন এটাকে ভুলতে বসেছে। একটা যুবক রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়িকে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছে, বেশ কয়েক জন মানুষকে মেরেও ফেলেছে। এর জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে কেন এ রকম করেছে। তখন সে উত্তরে বলল, "এমনিই ইচ্ছে হল, কাউকে গুলি করে মারি।" এরকম উদাহরণ অনেক আছে। অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, ইচ্ছের বশে কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করে ফেলাটা সমাজে আজকাল আকছার ঘটছে। এসব এখন আর কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা হয়ে থাকেনি। যাঁরা খবর দেখেন বা পড়েন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটা জানেন। সমাজ যে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তার মূল কারণগুলো হল, আজকাল মানুষের মধ্যে সুগভীর কোনো মূল্যবোধ নেই; আবেগ ও প্রলোভনের মুখে পড়ে মানুষ এখন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না।

এই অবস্থাকে বদলানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংবাদ মাধ্যমকে বদলাতে হবে। কিন্তু, শিক্ষা মানে শুধু জ্ঞান দেওয়া নয়; বরং এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যে, কী ঠিক আর কী ভুল, এই সচেতনতা জাগিয়ে তোলা যে, আমাদের সর্বশক্তিমানের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। একমাত্র তখনই বেশির ভাগ মানুষ তাদের বিবেক অনুযায়ী কাজ করবে। মুসলমান ও অন্যান্য নানা ধর্মের মানুষের বিশ্বাস, পৃথিবীতে একদিন কেয়ামত আসবে। যদি সত্যিই তেমন কোনো দিন আসে, তাহলে সংবাদ মাধ্যমের নামজাদা লোকেদের অতি অবশ্যই সেই শেষ বিচারের মুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ তাঁরাই হিংসা, যৌনতা ও ব্যভিচারের কথা প্রচার করেন। যে-কাজ করার কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না, সেসব কথা হালকা চালে বলতে থাকলে, সেই সব কাজ করার কথা আস্তে-আস্তে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করে দেয়। তখন আমাদের যুব সমাজ হয়তো লাম্পট্য ও দুরাচারের পথে পা বাড়াবে। এসব অপকর্মে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে দেখবে কেমন লাগে। এরপর গোটা সমাজ এই নেশায় মশগুল হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দেশ তাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে খুব চাতুর্যের সঙ্গে অবাধ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিশেষ করে যখন সেই দেশগুলো হয় অসীম শক্তিশালী এবং তাদের প্রতিপক্ষরা হয় একেবারে দুর্বল। কোনো একটা

দেশ স্পর্ধা দেখিয়ে আগ্রাসী হয়ে উঠলে, সেই দেশের উপর বিশাল সামরিক শক্তিধর দেশগুলো সর্বশক্তি নিয়ে হামলা চালায়। ওই দেশগুলোর থেকে বলতে গেলে সামরিক শক্তিধর দেশগুলো কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়ে না। কিন্তু যখন কোনো দেশ ভয়ংকর আগ্রাসী হয়ে এগিয়ে আসে, তখন এই শক্তিধর দেশগুলোই পিছু হটতে বাধ্য হয়। কেননা, তারা বুঝতে পারে, "এখানে চিঁড়ে ভিজবে না।" শক্তিধর দেশগুলোর এই দ্বিচারিতার মুখে পড়ে মূল্যবোধ ও নীতি-আদর্শের শুকনো পাতা ডাল থেকে খসে পড়ে যায়। যেসব দেশে তারা হামলা চালায়, সেখানে মারা যায় সাধারণ মানুষ। আবার যেখানে তারা হামলা চালানো থেকে পিছু হটে আসে, সেখানেও মারা যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষ। তাদের সাহায্যের জন্য শক্তিধর দেশগুলো এগিয়ে আসে না। তাই বলতে গেলে, দু' দিক দিয়েই সাধারণ মানুষেরই প্রাণ যায়। 1991 সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় একজন সেনানায়ক খুবই শক্তিশালী ও খোলামেলা মন্তব্য করে বলেছিলেন, "মৃতদেহ গোনা আমাদের কাজ নয়।" এটা ঠিকই, তিনি অপর পক্ষের মৃতদেহর কথা বলেছিলেন।

যুদ্ধ ও শান্তি

ইসলামে যুদ্ধের নীতিগুলো খুবই পরিষ্কার। পয়গম্বর মহম্মদ নিজে সেগুলো বিশদে ব্যাখ্যা করে গেছেন। হয় আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হবে, বা যেখানে অত্যাচার-অনাচার হচ্ছে, সেখান থেকে সেসব দূর করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। আজকাল যাকে ন্যায্য কারণ বলা হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধ যে জন্যই করা হোক না-কেন, খেয়াল রাখতে হবে, নিরীহ মানুষ ও পরিবেশের যেন কোনো ক্ষতি না-হয়। আগ্রাসন রোধ করার জন্য জোটবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোরানে বলা হয়েছে, "মুমিনদের দু'পক্ষের মধ্যে যদি বিবাদ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে। কিন্তু কোনো এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর চড়াও হয়, তাহলে সবাইকে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আক্রমণকারী আল্লাহর আদেশকে মেনে নেয়। আল্লাহর আধেশকে যদি মেনে নেয়, তাহলে ন্যায় ও ন্যায্য অনুযায়ী তার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হবে। কেননা, যারা ন্যায্যের পক্ষে থাকে, আল্লাহ তাদেরই ভালবাসেন।" (49:9)

ন্যায্য কারণে অ-মুসলমানদের সঙ্গেও জোট করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এই উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, নাস্তিকদের হাত থেকে মদিনা শহরকে রক্ষা করার জন্য পয়গম্বর মহম্মদ একটি চুক্তি করেছিলেন ইহুদিদের সঙ্গে। পয়গম্বরও এমন একটা চুক্তির উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ইসলাম প্রবর্তনের বহু আগে মক্কার জনগোষ্ঠীয় মানুষদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল এই মর্মে যে, তারা নিপীড়িতদের সাহায্য করার জন্য একজোট হয়ে

কাজ করবে। পয়গম্বরের মন্তব্য ছিল, "এই জোট হয়েছিল ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার বহু আগে। কিন্তু ইসলামেও যদি এমন জোট করার জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হত, তাহলে আমিও সেই জোটে গিয়ে যোগ দিতাম।" পয়গম্বর তাঁর সৈন্যকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সৈন্যদের কাজ হবে শুধু যুধ্যমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তারা যেন যুদ্ধ করতে গিয়ে মহিলা, শিশু ও বয়স্ক মানুষদের কোনো ক্ষতি না-করে। অ-মুসলমান ধার্মিকরা যদি তাঁদের মঠ বা উপাসনালয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রু পক্ষের গাছ-গাছালি কাটা যাবে না, বা সেগুলোতে আগুন ধরানো যাবে না। কোনো পশুরও যেন কোনো ক্ষতি করা না-হয়, বা জবাই করা না-হয়। একমাত্র ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য তা করা যেতে পারে। এইসব কড়ার পর্যালোচনা করলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যায়, ইসলামি যুদ্ধ নীতির এসব উচ্চ ধ্যান-ধারণাকে আধুনিক যুদ্ধে বাস্তবায়িত করতে হলে বিশেষ প্রয়াস পেতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধই মনে হয় শেষ যুদ্ধ ছিল, যেখানে লড়াইটা শুধু সৈন্যদের মধ্যেই হয়েছিল। ত্রিশের দশকের স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর থেকে নিয়মগুলো বদলাতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, কোরিয়ার যুদ্ধে ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে। আর এর জ্বলন্ত সাক্ষী তো হিরোসিমা ও নাগাসাকি। এই দুই শহরে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল। এ ছাড়াও আছে ভিয়েতনামে ব্যাপক বোমা বর্ষণের ঘটনা, এবং সে-দেশেই করা হয়েছিল "ফ্রি ফায়ার জোন", সেখানে সেনারা আগাম কোনো অনুমতি না-নিয়েই যাকে ইচ্ছে তাকে গুলি করতে পারত। শুধু যে মানুষকেই মারা হয়েছে, তা নয়। বাদ যায়নি পশু-পাখি ও গাছপালাও। এমনকী ক্ষতি করা হয়েছিল খোদ মাটিরও।

এসবের জন্যই কেউ-কেউ মনে করেন যে, আজকের যুগে ইসলামি যুদ্ধ নীতি হল শুধুই তত্ত্ব কথা, তাই অচল। মুসলমান ও অন্যান্যরা অবশ্য এই বিষয়টাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখে। আধুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহ মানেই ব্যাপক বিপর্যয়। তাই সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে আর বিকল্প বলে মনে করা ঠিক নয়। দাস প্রথার মতো যুদ্ধ-বিগ্রহকেও বিলোপ করা উচিত। এটা একটা অশুভ ইঙ্গিত যে, নতুন পৃথিবীর নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য সেনা অভিযান উপলক্ষে। এর পর আর যা-যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেসব দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, নতুন পৃথিবীর নিয়মে নতুনটা কী আছে। এ তো সেই পুরনো নিয়মই। আগে শুধু প্রতিপক্ষ দু'জন ছিল, আর এখন হয়েছে একজন।

মানবজাতি এই মুহূর্তে সভ্যতার একেবারে শীর্ষে অবস্থান করছে। এমনটা আগে কখনো দেখা যায়নি। এখন সেই মানবজাতি দ্বিতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ করছে। নতুন পৃথিবীর নিয়ম ঘোষণা করছে, তাকে নিয়ে উদযাপনে মেতে উঠেছে। যুদ্ধহীন পৃথিবী গড়ে তোলা, এবং ন্যায্য শান্তি স্থাপনের বিকল্প পথের

সন্ধান পাওয়া, এখন আর কোনো আকাশ-কুসুম নয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বিবাদ আছে, সেগুলোর নিষ্পত্তি করতে পারল না কেন স্বতন্ত্র আদালতগুলো? আসলে, যুদ্ধ এখন এই নিয়ে হয় না যে, কে ধর্মের পথে আছে, আর কে অধর্মের পথে আছে। এখন যুদ্ধ করা হয় নিজের শক্তি জাহির করার জন্য। এটা দেখানোর জন্য যে, কার কাছে সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আছে। যদি আদালত স্থাপন করা যায়, যারা বিবাদ-সংঘাতকে সৎ ও নিরপেক্ষ ভাবে নিরসন করতে পারবে, এবং তা করার ইচ্ছাও মনে থাকবে, (এর মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ ও তার নিরাপত্তা পরিষদকে রাখা চলবে না) তাহলে যে-কোনো সংঘাতকেই স্বচ্ছ ও ন্যায্য ভাবে নিরসন করা সম্ভব। এমন প্রস্তাব সফল হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন সভ্য দেশগুলো মনস্থির করবে যে, তারা সভ্য হয়ে থাকবে! এর জন্য সত্যের পক্ষে থাকতে হবে। কিন্তু কেউ-ই স্বীকার করতে চায় না যে, তারা সত্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে কিন্তু তারা সত্যের বিপক্ষেই আছে। সত্য হল একটা মূল্যবোধ। কিন্তু পরিতাপের কথা, সেই মূল্যবোধ রাজনীতির চোখের আড়ালেই থেকে যায়। আজকের যুগেই এটাই হল আসল সমস্যা।

আইন যে-ন্যায়ের কথা বলে, তা কি শক্তিশালীরা মেনে নেবে? না কি তারা এ কথাই বরাবরের মতো বিশ্বাস করতে থাকবে যে, মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম? সেনা-শিল্পের জোট কি তাদের উদ্দেশ্যকে পরিহার করবে? যখন-তখন তারা কি কোনো না-কোনো যুদ্ধকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করার পথ থেকে দূরে সরে থাকবে? পৃথিবীর সম্পদকে বণ্টন করার ক্ষেত্রে, এবং সম্পদ আহরণ করার পরে নতুন সম্পদ তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে ন্যায়ের পথ কি অবলম্বন করা হবে? অবশ্যই করা হবে না। কেননা, বর্তমান পৃথীবীর প্রভুদের পক্ষে সেটা করা তো অধর্ম হবে। বড়সড় কোনো বদল না-এলে তারা ন্যায়ের পথে পা মাড়াবেই না। আর বদল কিন্তু আকাশ থেকে পড়বে না। বদল আসবে নীচ থেকে, যা ক্রমশ উপরের দিকে উঠবে। বদল আসবে একেবারে নিচু তলা থেকে।

বাস্তুতন্ত্র

উন্নয়নশীল দেশের গরিবরা অন্ন সংস্থানের জন্য টাকা রোজগার করতে গিয়ে, নিজেদের ঋণ শোধ করতে গিয়ে, সেনাবাহিনীর অস্ত্র জোগাতে গিয়ে, নিজেদের স্বৈরাচারী শাসকদের রক্ষা করতে গিয়ে, নিজেদের দেশের শাসক ও অভিজাত শ্রেণির চির অতৃপ্ত ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে, নিজেদের দেশের প্রকৃতিক সম্পদকে শেষ করতে তারা বাধ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণির লক্ষ্য হল, ধনীকে আরও ধনী করা, ভোগবাদী আদর্শকে আরও বড় করে তোলা,

নিজেদের বিলাসিতাকে বাড়ানো, নিজেদের আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে থাকা। এসব করতে গিয়ে শিল্পোন্নত বিশ্ব ক্রমশই বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করছে; বাস্তুতন্ত্রকে বিষাক্ত, দূষিত ও শেষ করে দিচ্ছে। এসব হচ্ছে এমনই এক সময়, যখন জৈব পরিসরকে নাটকীয় ও অভূতপূর্ব ভাবে প্রাভাবিত করার মতো ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এসব হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সময়ের মধ্যে। এ ছাড়া তো পূর্ণ মাত্রার আধুনিক যুদ্ধ আছেই। সে-ও আলাদা করে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে, সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতের থেকে অতিমাত্রায় ঋণ নিয়ে চলেছি। কিন্তু, যুক্তি ও বিবেচনা পূর্ণ অনুমানে আমরা বুঝতে পারছি যে, আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর এত ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি যে, তারা তা শোধ করতে পারবে না। প্রতিকারের কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, এবং কোন-কোন পরামর্শকে কাজে লাগানো যেতে পারে, সেসব কথাই বলা হয়ে গেছে। কিন্তু, প্রত্যাশা মতোই এসব ব্যবস্থা ও পরামর্শকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে উঠছেন শাসন ক্ষমতায় থাকা লোকেরা। তারাই রক্ষা করে চলেছে অবাধ, লোভী, স্বার্থপর, অতিভোজী ও অদূরদর্শী পুঁজিবাদকে। কোরানে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যে মানুষের জীবন নিয়ে এমন সব কথা বলে, যা শুনে চমক লেগে যাবে। সে বলে যে, সে যে সব সত্যি বলছে, তার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ, তবুও সে অনেকের চোখে শত্রু হয়ে উঠেছে। সে যখন নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যায়, তখন সে সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায় আর অন্যায়-অত্যাচার চালাতে থাকে। দেশের মাটি ও দেশের মানুষকে শেষ করতে থাকে। আল্লাহ কিন্তু এই অন্যায়-অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেয় না।" (2:204-205)

বড়-বড় ব্যবসায়ীরা তীব্র বিরোধ করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে পরিবেশ আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। 1990 সালে বসুন্ধরা দিবসে 140টি দেশের 10 কোটি মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। সেটা ছিল নিচু তলার মানুষের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ প্রদর্শন। রাজনৈতিক নেতারা এইসব মানুষকে অবহেলা করতে পারেন না, তা নাহলে তাঁদের যে ভোট খোয়াতে হবে। এখনই হয়তো আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থা গড়ে তোলার সঠিক সময়। সেই সংস্থায় পৃথিবীর সব দেশের সরকারগুলোকে যোগ দিতে হবে, এবং সবাইকে এটা প্রথমে মেনে নিতে হবে যে, তারা এই সংস্থার সুপারিশগুলোকে স্বেচ্ছায় বাস্তবায়িত করার পথে পা বাড়াবে। সেই সুপারিশে অতি অবশ্যই ন্যায় রক্ষার কথাটা ভুললে চলবে না।

জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যা

জনসংখ্যা এমন গতিতে বাড়ছে যে, পৃথিবীর বর্তমান সম্পদ দিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করা যাবে না। তাই জন বিস্ফোরণ নিয়ে চিন্তা করার

পিছনে যুক্তি অবশ্যই আছে। তৃতীয় বিশ্বেরই বেশির ভাগ দেশে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে বলে, এই দেশগুলোর বিরুদ্ধে পশ্চিমী দুনিয়ার অভিযোগ, এই দেশগুলো দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আচরণ করে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও ভাবা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু দেশ অন্যান্য বিভিন্ন দেশকে আর্থিক সাহায্য দেয়। তারা এখন এমন ধারণার প্রচলন করতে শুরু করেছে যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যকে পূরণ করতে পারলেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তার চেয়েও খারাপ অবস্থা এই যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে টিকা প্রদান কর্মসূচি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে, তা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটি পরিবারই বহু সন্তানের জন্ম দেয়, এই ভাবে জনসংখ্যা বেড়ে যায়, আর সেই বর্ধিত জনসংখ্যা পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করতে থাকে। যার পরিণতিতে পৃথিবীতে বারে-বারে মহামারী ও মৃত্যুর ঘটনার ঘটতেই থাকে। এই মতামত নিয়েই পর্যালোচনা করেছেন ড. জাঁ মার্টিন, তাঁর একটি প্রবন্ধে। তাঁর লেখা সেই প্রবন্ধের নাম "উড ম্যাকিয়াভেলি নাও বি এ বেটার গাইড ফর ডক্টরস দ্যান হিপোক্রেট?"[15] (ভণ্ডদের তুলনায় ম্যাকিয়াভেলিই কি ডাক্তারদের ভাল পথ দেখাতে পারবেন?) আসলে এখানে তৃতীয় বিশ্বে মৃত্যুর হারকে হ্রাস করার একটা সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে ম্যাকিয়াভেলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে, কারো-কারো মনে হয়েছে, মানবতা থেকে 'বাস্তবতা'-র দিকে পা বাড়ানোটাই যুক্তিযুক্ত।

সমস্যা যে একটা আছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যেসব পরিবার সুরক্ষিত, বিশ্বস্ত ও প্রাপ্তিসাধ্য গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে (বল প্রয়োগ ছাড়া), তাদের অতি অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। এই কথাটা সত্যিই মানতে হবে। ইসলামেরও এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আমাদের আপত্তি শুধু এটাই যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সব দোষ সরাসরি ও পুরোপুরি ভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকেই দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো পুরোপুরি সত্য নয়। এটা তো আসলে বহুমুখী সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বের উপর দোষ চাপিয়ে একটা বিষয়কে এড়িয়ে চলা হয় যে, "বাংলাদেশে একজন শিশুর জন্ম হলে সারা পৃথিবীর সম্পদ ও পরিবেশের উপর যা চাপ পড়ে, তার একশ গুণ বেশি চাপ পড়ে" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন শিশুর জন্ম হলে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন-এ এ কথা লিখেছেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বিভাগের পল ও অ্যানি এহরিলিচ। তাঁরা এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, গরিব দেশগুলো গরিবই হয়ে থাকে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য, কিন্তু ধনী দেশগুলোয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার ফলে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা পৃথিবী হারিয়ে ফেলছে।[16]

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা হ্রাস করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (বিশেষ করে 1974 সালে বুখারেস্টে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড পপুলেশন কনফারেন্সে)। ইতিহাস (ইউরোপে কীসের জন্য প্রজননের হার হ্রাস পেয়েছিল, তা নিয়ে অধ্যয়ন) ও সাধারণ বোধ-বুদ্ধি বলে যে, উন্নয়ন হয়েছে বলে প্রজনন হ্রাস পেয়েছে; প্রজনন হ্রাস পাওয়ার ফলে উন্নয়ন হয়নি। তাই বলা যায়, উন্নয়নই হল শ্রেষ্ঠ প্রতিকার ব্যবস্থা। এ কথা সবারই জানা, উন্নয়ন অনিশ্চিত থাকলে প্রজনন বৃদ্ধি হবেই। তবুও পুঁজিবাদী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর অহেতুক খুব বেশি জোর দিতে থাকে। মানব-কল্যাণের লক্ষ্যে জনসেবা বা পরোপকারের চেয়েও অন্য কিছু কাজ করে তাদের মনে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এবং বিশ্ব ব্যাপী ক্ষমতার ভারসাম্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংখ্যা অনুপাতে বেড়েই চলেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট-এর ড. নিকোলাস এবারস্ট্যাড। এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছিলেন তাঁর একটি রিপোর্টে (যা আসলে তৈরি করা হয়েছিল ইউএস আর্মি কনফারেন্স অন লং রেঞ্জ প্ল্যানিং-এর জন্য)। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর গ্রীষ্ম, 1991 সংখ্যায়। তিনি সেখানে এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, তিন প্রজন্মের পর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আটজন প্রপিতামহ-প্রমাতামহের উত্তরাধিকার থাকবে মাত্র চার বা পাঁচজন। কিন্তু আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের বেশির ভাগ অঞ্চলেই উত্তরাধিকারীর সংখ্যা হবে তিনশোরও বেশি। আজকের প্রথম সারির দেশগুলো ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রতম দেশে পরিণত হবে। "ইমপ্লিকেশন্স অব ওয়ার্ল্ডওয়াইড পপুলেশন গ্রোথ ফর ইউএস সিকিউরিটি অ্যান্ড ওভারসিজ ইন্টারেস্টস"[17](মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের উপর বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব) নিয়ে অধ্যয়ন করে একটি নথি তৈরি করা হয়েছে। যার নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডি মেমোরেন্ডাম 200 (জাতীয় সুরক্ষা অধ্যয়ন স্মারক)। এখান থেকে অনেক কথা জানতে পারা যায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিকের জটিল প্রভাব উন্মোচিত হয়েছে এখানে। সেই সঙ্গে আমাদের বসাবাসের এই পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবও এখানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: জনসংখ্যার সমস্যাই হয়তো বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বীজ; সেই সঙ্গে এরই ফলে হয়তো বৈদেশিক অর্থনীতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা তা রক্ষার পথ সীমিত হয়ে যাচ্ছে; দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি[18] ও তরুণদের মধ্য থেকেই উন্নয়নের তাড়ানা সৃষ্টি হবে; এই তিন কারণেই বিদেশি বিনিয়োগের নিয়ম ও শর্ত নিয়ে পর্যালোচনা করার দরকার পড়বে; এনকী যদি দেখা যায় যে, বেকারত্ব দূর করার জন্য খুব ভাল একটা উপায় হল সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, তাহলে সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার কথাও ভাবা হতে পারে। এই নথি পড়লে মাঝে-মাঝে এমন মনে হয় যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যেই অনুন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই দেশগুলোকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য।

আমাদের হয়তো মনে হতে পারে, বিশ্বগ্রাম তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন পৃথিবীর নিয়মকে সক্রিয় করা উচিত। কেননা, আমাদের পৃথিবী ক্রমশ বিশ্বগ্রামই হয়ে উঠছে। এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে, পৃথিবীকে অনিবার্য ভাবে ধনী ও দরিদ্র, এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। তাই এই বিভাজনকে শেষ করার জন্য যুদ্ধ করাটাই অনিবার্য। ধনীদের এখন বিনয়ী হতে হবে, যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং তাঁদের বর্তমান জীবনযাপনে যেসব বিলাস-বৈভব ঢুকে পড়েছে, সেগুলোকে সাধারণের কল্যাণের স্বার্থে ত্যাগ করার মানসিকতা থাকতে হবে। এইসব বিলাস-বৈভব অত্যন্ত আবশ্যিক নয় মোটেও, বরং তাঁরা যদি মানবজাতির বিপুল অংশের জন্য আবশ্যিক সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে সেখান থেকেই তাঁরা মনে আনন্দ পাবেন। আনন্দ পাওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা করা যেতে পারে? যেখানই সমতা, সেখানেই আল্লাহর বাস!

জেহাদ

গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমী দুনিয়ার সংবাদ মাধ্যমগুলোতে জেহাদ শব্দটা ঘন-ঘন ব্যবহার করা হচ্ছে। 'ধর্মযুদ্ধ' বোঝাতেই সরাসরি বা খুবই সূক্ষ্ম ভাবে এই শব্দের প্রয়োগ হয়ে চলেছে। কিন্তু আসল কথা হল এই যে, 'ধর্মযুদ্ধ' (হোলি ওয়ার) শব্দটার জন্ম ইউরোপে, ক্রুসেডের সময়। যার অর্থ হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইসলামি শব্দ-ভাণ্ডারে এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। জেহাদ শব্দটা মোটেও ধর্মযুদ্ধ শব্দের অনুবাদ নয়।

জেহাদ মানে হল 'প্রয়াস পাওয়া'। প্রাথমিক ভাবে এর অর্থ, হীন কাজ ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকার জন্য অনবরত কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ এক সংগ্রাম। যা একান্ত ভাবেই নিজের মধ্যে চালিয়ে যেতে হয়। এটা অন্তরের ব্যাপার। এর উদ্দেশ্য হল, নিজেকে অবিচল রেখে ধৈর্য সহকারে উচ্চ নৈতিক আদর্শের পথে চলা। ইসলাম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং এই ধর্ম সমাজ তথা সামগ্রিক ভাবে মানব সমাজের কল্যাণের কথা বলে। একজন মুসলমান কখনই তার চারপাশের সমাজ বা ব্যাপক অর্থে সমগ্র বিশ্বের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একান্তে বসে শুধু নিজেকে উন্নত করার কথা ভাবতে পারে না। তাই তো ইসলামি দেশগুলোর প্রতি কোরান এই বিধান দিয়ে রেখেছে, "শুভ শক্তির পথে চলো এবং অশুভ শক্তিকে পরিহার করো।" (3:104) এই দায়িত্ব শুধু মুসলমানই নয়, বরং গোটা মানবজাতিরই পালন করা উচিত। কেননা, কোরানে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষই হল আল্লাহর প্রতিনিধি। কিন্তু অন্যরা এই দায়িত্ব এড়িয়ে চললেও, মুসলমানরা কখনই তা করে না। এই দায়িত্ব নানা ভাবে পালন করা যেতে পারে। আমাদের আধুনিক বিশ্বে এই কাজ করা যেতে পারে আইন, কূটনীতি, মধ্যস্থতা, অর্থনীতি ও

রাজনীতির মাধ্যমে।

অশুভ শক্তির মোকাবিলা করার সময় যদি কোনো উপযুক্ত পথ পাওয়া না-যায়, তাহলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের কথা ইসলামেও বলা হয়েছে। আগ্রাসন রোধ করার জন্য যৌথ সুরক্ষা নীতি ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে যে অগ্রণী ভূমিকার কথা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে উল্লেখ করা হয়েছে, তার আভাস কোরানেও পাওয়া যায়। যেমন, "... তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো (বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে)। কিন্তু কোনো পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর চড়াও হয়, তাহলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা পুনরায় আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে। " (49:9) তাই, যুদ্ধ হল জেহাদের একটা অংশ মাত্র, সব কিছু নয়। পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর সতীর্থদের সামনে এই কথাটার উপরেই জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সতীর্থরা একটি সামরিক অভিযান থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন পয়গম্বর তাঁদের বলেছিলেন, "আজ আমরা ক্ষুদ্র জেহাদ (যুদ্ধ) থেকে ফিরে এসেছি বৃহৎ জেহাদে (আত্ম-সংযম ও উৎকর্ষ সাধন)।"

জেহাদ মানে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা নয়, এবং অতি অবশ্যই খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে তো নয়ই। কিন্তু বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম ও রাজনৈতিক বৃত্ত এমন ধারণাই প্রচার করতে চায়। ইসলাম কখনো অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে না। মুসলমানদের মতো খ্রিস্টান ও ইহুদিরাও আব্রাহামের পরম্পরা অনুসরণ করে চলে, এবং একই ঈশ্বরের আরাধনা করে। তাই ওই দুই ধর্মের লোকেদের মুসলমানরা সতীর্থ বলে মনে করে।

'ন্যায়-ধর্ম সম্মত যুদ্ধ'-এ যে-কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়, তার নজির ইসলামে বহু আগে থেকেই আছে। সেই সঙ্গে কী-কী নীতি ও নৈতিকতার বাঁধনে থাকতে হয়, সে-কথাও বলা হয়েছে এই ধর্মে। আধুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এই সব নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। সে জন্যই, সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে যুদ্ধের বদলে অন্য কোনো বিকল্প পথের কথা ভাবতে হবে। এর জন্য সব পক্ষকেই ন্যায় সংগত একটা উপায়ে একমত হতে হবে। সারা পৃথিবীতে বুদ্ধিদীপ্ত ও সুদৃঢ় জনমত গড়ে উঠলে যুদ্ধবাজ মানসিকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এবং সেই মানসিকতাকে জয়ও করা যাবে। আসল কথা হল, মনে পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমা খুব গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। সেটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও কাজে আসতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে, জোর জবরদস্তি করে যেন তা করা না-হয়। এর জন্য চাই ন্যায় সংগত মধ্যস্থতা।

সততার স্বার্থেই আমাদের একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান,

খ্রিস্টান, ইহুদি, এবং অন্যান্য সব ধর্মের মানুষই নিজেদের ধর্ম ও দর্শনের মূল্যবান আদর্শগুলোকে সৎ ভাবে মেনে চলতে পারেনি। আমরা সবাই অনেক ভুল করেছি। ভবিষ্যতেও করব। মুসলমানরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখন ফের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বেচ্ছাচারীরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছে, বা অজ্ঞ জনযূথ ধর্মের নিয়মকে লঙ্ঘন করছে। এসবের মধ্যে ধর্মের দিকটা মোটেও ফুটে উঠছে না। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আরও ভাল শিক্ষা অর্জন করার জন্য মানুষ কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছে; মর্যাদা-অধিকার-স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ অনবরত চিন্তা করে চলেছে; ন্যায়ের জন্য অতন্দ্র প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এসবের জন্য দরকার হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লোভকেই সংবরণ করতে রাজি সবাই।

পরিবার ও যৌন বিবর্তন

পয়গম্বর মহম্মদ বলেছিলেন, "মহিলারা হল পুরুষদের অর্ধেক অংশ।" মানবজাতি বলতে পুরুষ বা মহিলাকে বোঝায় না। এ হল পুরুষ ও নারীর মিলন। যা সম্পন্ন হয় বিবাহের মাধ্যমে। এই মিলনের ফলেই গড়ে ওঠে পরিবার (ঠিক যেমন জলের ক্ষুদ্রতম অংশ কখনই শুধুমাত্র অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নয়, বরং এই দুয়ের সংমিশ্রণ)। ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও এই বিধান দিয়েছে যে, পুরুষ ও নারীর মিলনে গড়ে তুলতে হবে পরিবার। এই মিলন সম্পন্ন হতে হবে পবিত্র এক বন্ধনের মাধ্যমে। কোরানে যাকে বলা হয়েছে, 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা'। পরিণয়-বন্ধনে বা বিবাহ-চুক্তিতে তা নথিভুক্ত করে তার প্রমাণ রাখতে হবে।

বিবাহ মানে হল, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকা, তাঁদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বকে স্থাপন করা। তার পাশাপাশি তাঁদের সন্তানদেরও অধিকার রক্ষা করা, এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। সন্তানদের বৈধ পরিচয় পাওয়ার অধিকার আছে (তাদের এটা জানার অধিকার আছে যে, তাদের পিতা ও মাতা কে। তারা যে-পিতা ও মাতার সন্তান, সেই অনুযায়ী, তারা কী-কী সুবিধা ভোগ করতে পারে। আইন সম্মত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই তাদের জন্মানোর অধিকার আছে।); তাদের স্নেহ ও যত্ন সহকারে লালন-পালন করতে হবে; তাদের তাদের শরীর-মন বিকাশের পাশাপাশি, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও বিকশিত করতে হবে; তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; তাদের এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে পারে, সেই সঙ্গে পরিণত ও উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে যাতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে, বা কোনো কারণে অক্ষম হয়ে গেলে, তাঁদের

সেবা-যত্ন করাটা সন্তানদের এক ধর্মীয় দায়িত্ব। পিতা-মাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার নিতে হবে সন্তানদের। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্তানরা কখনই নিজেদের ধৈর্য হারাতে পারবে না। পিতা-মাতার সেবা করার মাধ্যমে আসলে আল্লাহর ঋণই শোধ করা হয়। তাছাড়া এটা এক ধরনের চিরস্থায়ী বিমাও বটে। কেননা, আজ যারা সন্তান, তারা একদিন নিজেই সন্তানের জন্ম দেবে ও তাদের পিতা-মাতা হবে, একদিন তারাও বৃদ্ধি হবে, তখন তারাও চাইবে, তাদের সন্তান তাদের সেবা-যত্ন করুক।

পারিবারিক বন্ধন ও মজবুত পারিবারিক সম্পর্ককে ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বন্ধন অণু পরিবারের সীমানাকে পার করে রক্তের সম্পর্কের বৃত্তকে ক্রমশ প্রসারিত করতে থাকে। কোরানে একেই বলা হয়েছে, "গর্ভের সম্পর্ক"। স্নেহ ও প্রীতির মাধ্যমে রক্তের সম্পর্কের লোকেদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করা, বা তাঁদের প্রয়োজনে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করাটা একটা দায়িত্ব এবং এই ধরনের বদান্যতা প্রকাশ করলে সুফলও পাওয়া যায় বটে। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর, তাঁদের আত্মার শান্তির কামনা করে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে হয়। প্রয়োজন পড়লে তাঁদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও করতে হয়।

ইসলামে বিবাহ দু'টো দায়িত্ব পালন করে। একমাত্র বিবাহই সেই দু'টো দায়িত্ব বৈধ ভাবে পালন করতে পারে। বিবাহের প্রথম কাজ হল, একটি অর্থ যে আরেকটি অর্ধের সঙ্গে মিলে পূর্ণতা পেতে চায়, তার সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা। কোরানে বলা হয়েছে, "তাঁর বিভিন্ন আভাসের মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে থেকেই, সঙ্গীদের তৈরি করেছেন। তাদের সঙ্গেই তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে। তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহমর্মিতা স্থাপন করেছেন।" (30:21) বিবাহের আরেকটি কাজ হল প্রজননে সহায়ক হয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়া। কোরানে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের জন্য, তোমাদের মধ্য থেকে, সঙ্গীদের তৈরি করেছেন। তোমাদের সঙ্গীদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান ও তার পরবর্তী উত্তরপুরুষদের তৈরি করেছেন, তিনি তোমাকে নিজগুণ দান করেন। তাহলে তারা কি অসার কোনো জিনিসে বিশ্বাস করবে? তারা কি আল্লাহর দোয়াকে অস্বীকার করতে পারবে?"

বিবাহ ও প্রজননের একমাত্র বৈধ স্থান হল বিবাহ। এই ধরনের সম্পর্ক বিবাহ বহির্ভূত ভাবে স্থাপন করা হল অনেক বড় পাপ। এই ধরনের যৌন মিলন যদি চারজন প্রত্যক্ষ করে শনাক্ত করতে পারে যে, কারা এই ধরনের সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল, এবং যদি প্রমাণ করতে পারে যে, তারা দু'জনকে একে

অপরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে দেখেছে, (যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে বলে মনে করলে হবে না, তা অনুমান করলে হবে না। কেননা, অনেক সময় মানুষের অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কারণে সেই রকম ধারণা হতেও পারে), তাহলে ইসলামে সেই ধরনের সম্পর্ককে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কারো বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী যদি ব্যাভিচারী হওয়ার অভিযোগ আনেন, তাহলে সেই সাক্ষীকে আইনের কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হবে। এ রকম একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে কেউ যাতে কোনো মিথ্যে অভিযোগ তুলতে না-পারে, সে দিকেও খেয়াল রাখা হয়েছিল এইসব নিয়ম তৈরি করার সময়। তা করা না-হলে অহেতুক একটা পরিবার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবাহের আগে কৌমার্য রক্ষা এবং বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার নিয়ম আমেরিকা ও পশ্চিমী দুনিয়ায় এক সময় ছিল। কিন্তু সেসব দেশে নাস্তিক ও ক্ষুদ্র-আস্তিক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ যত বেড়েছে, ততই আগের সব নিয়ম অনিবার্য ভাবেই ওলোটপালট হয়ে গেছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মানে হল নাস্তিকতা। ক্ষুদ্র-আস্তিকতা বলা হয় তাকেই, যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হলেও, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব অনেকটাই কমে যায়। মানুষ তখন তাঁকে নিজের মর্জি মাফিক পুজো করে। মানুষ তখন সপ্তাহে একবার উপাসনালয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন কীভাবে যাপন করবে, সে-সম্পর্কে ঈশ্বরের উপদেশ শুনতে চায় না। ধর্মে এই ভাঙনের ফলেই 'যৌন সম্পর্ক বিবর্তন'-এর ভিত তৈরি হয়েছে। কারণ সেই সময় সমস্ত ধর্মীয় মূল্যবোধেরই আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল।

অনেকেই মনে করেন, যৌন সম্পর্কে বিবর্তন আসতে শুরু করেছিল 1960-এর সময় থেকে। আসলে কিন্তু তা নয়। নিষ্ক্রিয় ও প্রাকৃতিক কোনো সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই এই বিবর্তনের সূত্রপাত হয়নি। আসলে এই পরিণতি দেখা দিয়েছিল সেই সব মানুষের সুপরিকল্পিত ও ক্রমাগত প্রয়াসের ফলে, যারা যৌনতার দিক দিয়ে সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিবর্তন আনতে চাইছিল। গির্জাকে যখন আর জনজীবনে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হল না, তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতা দেখে সমাজ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। তার পর থেকেই যৌন জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে দিল। প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হিসাবে ধর্মের যে-আসন ছিল, সেখানে বিজ্ঞান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর, অনেকেই ভাবতে শুরু করে দিল যে, মানুষের সমস্ত বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত রায় দেবে মানুষই। যুগ-যুগ ধরে যেসব মূল্যবোধকে মানুষ নিজের মনে লালন করত, সেগুলো নতুন যুগে হারিয়ে যেতে বসল। কিন্তু মানুষ তাড়াহুড়োর চোটে এবং নিজের ভাসা-ভাসা বোধ-বুদ্ধির জেরে একটা অবশ্যম্ভাবী দিককে উপলব্ধি করতে ভুলে গেল। মানুষ নিজেই স্বীকার করে, মানুষের মন কখনো নিখুঁত

হতে পারে না। তাতে ভুল-ত্রুটি থাকবেই। তবুও এটা বুঝতে পারল না যে, নৈতিকতার পরম মানদণ্ড নিয়ে মানুষ সব সময় চূড়ান্ত রায় দিতে পারে না। কেননা, মানুষের মনে নানা সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ অনবরত অধ্যবসায় সহ জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জন করতে চায়, গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যায়, মানুষ নিজেই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তার এখনও অনেক কথা জানা বাকি। আমাদের যদি সত্যি মনে হত, আমরা সব জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি, এবং আমাদের মন সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত; তাহলে, আমাদের জীবন ও চারপাশের জগৎ সম্পর্কে অহরহ জ্ঞান অর্জন করার নামে যাবতীয় অধ্যয়ন ও গবেষণা বন্ধ করে দিতাম। গবেষণার নামে বিপুল অর্থ আর খরচই করতাম না। মানুষের জ্ঞান কিন্তু সীমিতই। কেননা, কোরানে বলা হয়েছে, "জ্ঞানের অতি সামান্য অংশ তোমাকে (মানবজাতিকে) দেওয়া হয়েছে।" (17:85)

ঈশ্বরের আসনে নিজেকে বসানোর চেষ্টা মানুষ বারে-বারে করেছে। দু'টো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে একটা আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার নাম ছিল 'ধর্মহীন নৈতিকতা'। মানুষে-মানুষে যে-সংঘাত ও শত্রুতা, তার জন্য মানুষ দায়ী করল ঈশ্বরকে, নিজেদের ত্রুটিকে নয়। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া লোকেরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না-থেকেই উচ্চ নৈতিক আদর্শের পথে চলা যেতে পারে। তারা এই আদর্শের নাম দিয়েছিল 'ধর্ম বিবিক্ত নৈতিকতা'। খাতায়-কলমে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খুব কম সংখ্যক মানুষ। কিন্তু এই আন্দোলন যে-দার্শনিক মত প্রচার করেছিল, তা ধীরে-ধীরে বহু মানুষের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছিল। কেননা, মানুষের তখন ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ আসলে তখন দেখতে পাচ্ছিল যে, বাইবেলে যা বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন অনুসন্ধানে সে সবের কিছুই মিলছে না। ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বরও ক্রমশ সিংহাসনচ্যুত হচ্ছিলেন। নৈতিকতার নতুন-নতুন বিধি স্থাপন করা হচ্ছিল। অতীতে যা ছিল অনৈতিকতা, তা-ই সেদিন নৈতিক মানদণ্ড হয়ে উঠছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবিকতা তখন খোলাখুলি এই ঘোষণা করল যে, মানুষের মূল্যবোধ নির্ধারণ করবে মানুষই। এর জন্য অমানবীয় বা অতিপ্রাকৃত কোনো নীতির দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ বস্তুবাদী হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে শ্লীলতা, কৌমার্য ও বিশুদ্ধতা ইত্যাদি শব্দ ফাঁকা বুলি হয়ে গেল। সেগুলো অপ্রচলিত হতে থাকল। উচ্ছৃঙ্খলতাকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার সীমাকে বাড়াতে পুরো মাত্রায় নতুন মন্ত্রে সবাইকে দীক্ষিত করার কাজ চলছিল। যে-সমাজে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে ব্যক্তির খেয়াল-খুশিই হয়ে উঠছিল মানবাধিকার।

যে-বান এসে সমাজের সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই বানে

ভেসে যেতে বসেছিলেন তাঁরাও, যাঁরা যুগ-যুগ ধরে পরম্পরা ক্রমে ধর্মকে রক্ষা করে আসছিলেন। অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাঁরাও যখন ভেসে যেতে লাগলেন, তখন নৈতিকতা আরও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত যাজকরা ট্রয়ের ঘোড়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা উদারবাদীদের হাত ধরার জন্য ধর্মের শিবির ছেড়ে চলে গেলেন না; বরং তাঁরা ধর্ম নিয়েই নতুন করে কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। ধর্মের সমগ্র ইতিহাসে যা ছিল অবৈধ ও নিন্দনীয়, সেগুলোকেই বৈধ ও অনুমোদনযোগ্য করে তোলার জন্য বাইবেলের কথাগুলোকে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে শুরু করে দিলেন। বহু যাজকই সেই সব কীটের শিকার হয়ে গেলেন, যেসব কীটকে আসলে দূর করার দায়িত্ব ছিল তাঁদেরই। অনেকে আবার এমনও ব্যাখ্যা দিলেন যে, কৌমার্য ব্রত পালন করা মানে হল বিবাহ না-করা, যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা নয়।[19]

এর পরিণথি যা হওয়ার ছিল, তা-ই হল। গোটা সমাজে দেখা দিল বিশৃঙ্খল যৌন আচরণ। বিবাহের পূর্বে কৌমার্য রক্ষা এবং বিবাহের পর বিশ্বাস রক্ষার নিয়মকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ফলে যৌনতা ক্রমশ অপবিত্র হতে লাগল। যৌনতা মানে হল পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিশেষ এক বন্ধন। কিন্তু এই পবিত্র বন্ধনের কথা মানুষ ভুলতে বসেছিল বলে অবাধ যৌন সম্ভোগের ঘটনা ঘটতে লাগল, ধর্ষণের ঘটনা বাড়তে লাগল, অপ্রত্যাশিত গর্ভাবস্থার সমস্যায় পড়তে শুরু করল মহিলারা, এর ফলে বাড়তে লাগল গর্ভপাতের ঘটনা, কেউ আবার অপ্রত্যাশিত গর্ভাবস্থার সমস্যার পড়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ফলে, সেই সব সন্তান বাবা-মা দু'জনেরই ভালবাসা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, সেই সন্তানেরা বড় হওয়ার পর বংশ পরম্পরায় সন্তানের জন্ম দেওয়া থেকে বঞ্চিত হল। তার উপর আবার, পরিবারের মধ্যে থাকা বিশ্বাসের সম্পর্কেও ভাঙন ধরতে লাগল। কেননা, বহু সুস্থিত পরিবারে দেখা গেল যে, তাদের পনেরো শতাংশ সন্তানই অবৈধ। এসব ছাড়াও স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করল। মহামারীর মতো ছড়াতে শুরু করল যৌন রোগ। নতুন-নতুন যৌনরোগ তো দেখা দিলই, এমনকী পুরনো যৌনরোগও ফের ছড়াতে শুরু করল। যেসব যৌনরোগকে কিনা আমরা অনেক আগেই নিঃশেষ করে ফেলেছি বলে ভাবছিলাম। যেসব জীবাণুর জন্য এই রোগগুলো হচ্ছিল, সেগুলোতে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা আর কাজ করছিল না। এর গুরুতর প্রভাব পড়ল সমাজে। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে। এর একমাত্র কারণ অবাধ যৌন সংসর্গ।

মুসলমানদের এ ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা নেই যে, তাদের ধর্মে কোনটা নৈতিক ও কোনটা অনৈতিক। কোরান যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিল, এখনও অবিকল সেই রূপেই আছে। প্রতিটা শব্দ এবং প্রতিটা বর্ণ একই আছে। কোরান হল ইলাহি শব্দ (কোনো ভাষাতেই এর কোনো অনুবাদ বা

ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, এমনকী আরবি ভাষাতেও শ্(কোরানের ভাষা) কোরান বলে কোনো শব্দ নেই। সেজন্য, কোরানে যেসব নৈতিকতা ও অনৈতিকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো চিরকাল থেকে যাবে। এতে কিছু মেশানো যাবে না, এতে কোনো কারসাজি করা যাবে না, বা একে যুক্তি খাটিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমন কোনো যাজক বা পণ্ডিতও নেই, যাঁরা কিনা এই দাবি করতে পারেন যে, কোরানকে ব্যাখ্যা করার মতো বিশেষ ক্ষমতা আছে তাঁদের। এর মানে এই নয় যে, মুসলমান মাত্রেই পুণ্যবান, তাঁরা কোনো পাপই করেন না। কোনো-কোনো মুসলমান অবশ্যই নিজেদের ধর্মের নীতিকে লঙ্ঘন করে পাপ ও ঘৃণ্য কাজ করে ফেলেন। কিন্তু, তাঁরা অন্তত এটা জানেন যে, তাঁরা পাপ করেছেন। পাপ থেকে বিরত না-হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর কাছে প্রায়শ্চিত্ত না-করা পর্যন্ত তাঁদের বিবেক দংশন হতেই থাকে।

নৈতিকতার পথে চলার সময় সেই সব মুসলমানই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন, যাঁরা অ-মুসলমান সমাজে বসবাস করেন। কেননা, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এমন এক নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে থেকে বড় হয়, যেখানে প্রতিনিয়ত সেই সব নিয়মের সঙ্গে ইসলামি শিক্ষার সংঘাত হয়। শুধু মুসলমানরাই নয়, সেই সব ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও একই সমস্যায় পড়ে, যারা নিজেদের ধর্মের উচ্চ আদর্শগুলোকে নিয়ে বাঁচতে চায়, এবং নিজের সন্তানদেরও সেই শিক্ষা দিতে চায়। এ ব্যাপারে সহায়-সহযোগিতা করার কাজ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে। মুসলমানদের এবং একই পন্থায় বিশ্বাসীদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একই পন্থায় বিশ্বাসী বলতে এখানে যাজক, সাধারণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে, সে ব্যাপারে দু'টো নীতি মেনে চলা হয়। প্রথমটা হল, আল্লাহর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার নীতি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত এই ধারণাকে অনুসরণ করা হয় যে, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানে হল, আল্লাহর নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাঁর নিয়ম আমরা যদি মেনে চলতে পারি, তাহলে আমাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে না যে, কে তারঁ নিয়ম মানল বা না-মানল। কেননা, একজনও যদি আল্লাহর পক্ষে থাকে, তার মানে এই যে, সে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে আছে। কেননা, তাঁর সৃষ্ট সমগ্র মানবজাতি একই রকম ভাবে তাঁর নিয়ম পালন করে যাচ্ছে।

ধর্মের পথে চললে এমন এক আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে যে, আশেপাশের লোক কে কী ভাবল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয় না। অতৃপ্ত লোভকে সংবরণ করা যায়। "সবাই তো এসব করে"— এই অজুহাত আর থাকে না। শুরুতেই 'টিকা দিয়ে রাখলে' সন্তানরা ধর্মীয় জ্ঞানের শক্ত ভিত পেয়ে যায়। তার ফলে তারা শারীরিক বা নৈতিক কোনো রোগের সংস্পর্শে আসার বহু আগেই রোগ

প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। যুদ্ধ করার আছে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ঠিক সে রকম ভাবে, ভবিষ্যতে যেসব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, সেসব নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। যাতে তারা আগে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তারা ধূমপান করবে কি না, মদ্যপান করবে কি না, মাদক সেবন করবে কি না, বা যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হবে কি না।

বিবাহের আগে কৌমার্য রক্ষার কথা শেখানো হয়। কিন্তু এটা পালন করার মতো একটা আদেশেৎ চেয়েও অনেক বেশি কিছু (এ-ও অবশ্য ঠিক যে, আল্লাহ যখন কোনো আদেশ দেন, তখন তা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে পালন করতে হবে)। মুসলমান ও অ-মুসলমান তরুণদের সঙ্গে আলোচনা করলে এই বিষয়টাকে আরও ভাল ভাবে তুলে ধরা যায়। অবশ্য সেটা পুরোপুরি বৌদ্ধিক ভাবে হতে হবে। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "কারা-কারা মনে করে, নারী ও পুরুষ সবাই সমান?" সবাই সর্বসম্মতিক্রমে এর পক্ষে রায় দেবে। "কারা-কারা ন্যায়ের পথে চলে?" এর উত্তরেও সবাই ইতিবাচক উত্তর দেবে। এরপর মত পেশ করা হবে যে, কোনো সম্পর্কে দু'পক্ষকেই যদি একই পরিণতি ভোগ করতে না-হয়, তাহলে তাদের মধ্যে থাকা সম্পর্কে ন্যায় থাকে না। এই কথাতেও সবাই একমত হবে। কিন্তু অবাধ যৌনতায় দু'পক্ষ সমান পরিণতি ভোগ করে না। এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরই নানা সমস্যায় পড়তে হয়। সে একা হয়ে যায়; গর্ভবতী হয়ে গেলে তাকে গর্ভপাত করাতে হয়; যদি সে সন্তানের জন্ম দিয়ে দেয়, তাহলে সেই সন্তানকে ছেড়ে দিতে হয়, যাতে অন্য কেউ দত্তক নিতে পারে; যদি সে সন্তানকে কাছে রাখে, তাহলে আজীবন তাকে একাই পিতৃহীন সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে হয়। এই পরিণতির কথা উল্লেখ করার পর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এটা কি ন্যায়সংগত?" তখন স্বাভাবিক ভাবেই সবাই বলবে, "না।"

যৌন বিবর্তনের মঞ্চে বেশ দেরি করেই বলতে গেলে সমকামী আন্দোলনের আবির্ভাব। সমকামিতার উদ্ভব নতুন করে হয়নি। এটা বলতে গেলে, সব সংস্কৃতিতে এবং সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু আজকের তুলনায় তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। লবিবাজি করে এবং বেশ সুসংগঠিত ভাবে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে এই ধারণাকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে তোলা হয়েছে গত দুই দশকে। আমার মনে পড়ে, আমি একটা বিদ্যায়তনিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র পেশ করা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্ব ব্যবহার করে এটা 'প্রমাণ' করা হয়েছিল যে, পায়ুকাম কতখানি সুরক্ষিত। এটা সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের কথা। সেখানে যেসব কথা বলা হয়েছিল, সেগুলো এতটাই পরস্পর-বিরোধী ছিল যে, আমার সাধারণ বুদ্ধিতে সেগুলো মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার বিদ্যায়তনিক জীবনে সেই প্রথমবার আমি কয়েক জন

বিজ্ঞানী গবেষকদের সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। তার কয়েক দিন পরেই, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করল, সমকামিতাকে আর কোনো রোগ বলে মনে করা হবে না, একে শুধুমাত্রা একটা যৌন অভিমুখিনতা বা যৌনতার একটা প্রকার বলে ধরা হবে। বাকিটা তো ইতিহাস।

এরপর চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখাপত্রে 'গে বাওয়েল সিনড্রোম' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে জানা গেল, সেটা এডস। তখনই বিষয়টা খবরের শিরোনামে উঠে এল। এর সঙ্গে সমকামিতার সংযোগ আছে বলে প্রতিষ্ঠিত হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিসর থেকে এডস সমস্যাকে বের করে দেওয়া হল। কেননা, সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজের নিয়ম-নীতিকে আরোপ করতে পারছিল না। এডস তখন রাজনৈতিক বিষয় হয়ে গেল। সমকামী লবি ততদিনে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। তারা তখন উচ্চ পদস্থ লোকেদের এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভয় দেখাতে পারার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। এর পাশাপাশি তারা সংবাদ মাধ্যমের থেকেও সমর্থন লাভ করতে লাগল। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের লোকেদের এবং যাজকদেরও পাশে পেয়ে গেল। এডস নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বদলে, চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। কাউকে রক্ত দেওয়া হলে সে এই রোগের কবলে পড়ে যেত, মাদকাসক্তরা এর কবলে পড়ল, গর্ভস্থ ভ্রূণ এর শিকার হল, বিপরীতকামী লোকেরা তাদের স্ত্রী (বা অন্য কারো) সংস্পর্শে এসে এতে আক্রান্ত হয়েছে, আবার অনেকে অসাবধানতাবশত শরীরের দূষিত ফ্লুইডের সংস্পর্শে এসে এর কবলে পড়েছে। এটা সারা বিশ্বে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে, এবং খুব দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে। এডস রোগীদের প্রতি মুসলমানদের সহমর্মিতা ও সমবেদনা আছে। আশার কথা এ-ও যে, এই মুহূর্তে উপলব্ধ সবচেয়ে ভাল চিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে পারে মুসলমানরা। যারা এই রোগে আক্রান্ত হতে চায় না, তাদের প্রতি আমাদের এটাই পরামর্শ যে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার মানে এই নয় যে, কন্ডোম ব্যবহার করলেই হয়ে যাবে। কেননা, সুরক্ষিত যৌনতা বলে আসলে কিছু নেই। সুরক্ষিত যৌনতার উপায় মাত্র একটাই। বিবাহের পূর্বে কৌমার্য রক্ষা এবং বিবাহের পরে বিশ্বাস রক্ষা।

সমকামিতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বলা হয়, "তুমি যেমনই হও না কেন, তা নিয়ে লজ্জা পেও না।" বহু তরুণ এসব নিয়ে কোনো সন্দেহ না-করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করে দেয়, এটা 'আবিষ্কার' করার জন্য যে, তারা আসলে কী। যৌন সম্পর্কের পূর্বশর্ত হল সম্মতি। সে জন্যই, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লবিগুলো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যৌন সম্পর্কে সম্মতির বয়সকে যেন চার বছর কমিয়ে আনা যায়। প্রত্যেক বছর ক্যালিফোর্নিয়াতে 'গে প্রাইড ডে' উদযাপন করা হয়। সেটা আবার সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশও

করা হয়। সমকামিতা নিয়ে গোঁড়ামি ও পূর্বসংস্কার দূর করার জন্য বেশ কিছু জেলার স্কুলে-স্কুলে 'গে প্রাইড মান্থ' পালন করা হয়। বিকল্প পরিবারের রূপ উপস্থাপন করার জন্য দুই পুরুষ বা দুই মহিলার সংসারের উদাহরণ দেওয়া হয়।

সমকামী অভিমুখিনতার সম্ভাব্য একটি শারীরিক ও জিনগত ভিত খোঁজার কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের জগতে। মুসলমানদের এতে কিছু যায় আসে না। কেননা, আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার: আমরা আমাদের ধর্মকে তৈরি করি না, এই ধর্ম আমরা লাভ করেছি, এবং আমরা এটাকে মেনে চলি। আমরা নিজেদের মতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু কোরান ও পয়গম্বর মহম্মদ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার সত্যতার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কোরানে স্পষ্ট ভাষায় ও খোলাখুলি ভাবে সমকামিতার নিন্দা করা হয়েছে। পয়গম্বর মহম্মদও তা-ই করেছেন। কারও এই যৌন অভিমুখিনতা থাক বা না-থাক, শরীরে 'সমকামিতার জিন' আছে বলে কারও মনে হোক বা না-হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, মনের বাসনা কখনো আচরণকে পরিচালিত করতে পারে না। আপনি হয়তো কোনো কিছু করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, (যেমন, আপনার স্বামী বা স্ত্রী নয়, এমন কারও সঙ্গে আপনি সমকামী বা বিপরীতকামী সম্পর্কে লিপ্ত হতে চাইছেন, বা আপনার মদ খেতে ইচ্ছে করছে, বা হিংস্র কোনো অপরাধ করতে ইচ্ছে করছে, বা চুরি করতে ইচ্ছে করছে), কিন্তু আপনার ইচ্ছে করছে বলেই আপনি তা করতে পারেন না। কোরানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ বা তাঁর রসুল যদি কোনো বিষয় ঠিক করে রাখেন, তাহলে তা নিয়ে কোনো পুরুষ বা মহিলার কিছু বলার থাকতে বলে মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে যদি কেউ অমান্য করে, তার মানে এই যে, সে নিশ্চয়ই ভুল পথে যাচ্ছে।" (33:36) প্রত্যেক মানুষের শরীরেই অবিসংবাদিত একটি জিন থাকে, সেটা ছাড়া কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সেটাকে বলা হয় 'আত্ম-সংযমের জিন'।

জৈব চিকিৎসার নীতি

প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

গর্ভনিরোধ

স্তন্যপান

ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস

গর্ভপাত

স্টেরিলাইজেশন

অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন

নার্ভাস টিস্যু প্রতিস্থাপন

অ্যানেনসেফালিক ফিটাস

যৌন গ্রন্থি প্রতিস্থাপন

মৃত্যুর সংজ্ঞা

ইউথেনেজিয়া

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

জৈব চিকিৎসা নীতির ক্ষেত্রে যে-বিষয়গুলো একেবারে প্রথম সারিতে আছে, সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে এই বিভাগে। এ ব্যাপারে ইসলামি মত স্বচ্ছ ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

গর্ভনিরোধ। ইসলামে গর্ভনিরোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যই খেয়াল রাখা হয়েছে যে, এর জন্য যাতে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রজননকে বাদ দেওয়া না-হয়। পয়গম্বর মহম্মদের কাল থেকেই গর্ভনিরোধ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আসা হচ্ছে। কিন্তু, তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী, দু'জনকে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইসলামি জাতির উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, তাদের কাজ হল সন্তান উৎপাদন করে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু, হজরত মহম্মদ শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির উপর জোর না-দিয়ে, গুণের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেগুলোর মধ্য তাঁর অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী হল, "এমন এক দিন আসবে, যখন অন্যান্য জাতিগুলো তোমাদের উপর এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক যেমন ক্ষুধার্তরা ভাতের থালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলমানরা তখন সংখ্যায় কম থাকবে বলেই কি তেমন অবস্থা হবে। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "মোটেও না। তখন তোমরা সংখ্যায় তো

অনেক হয়ে থাকবে, কিন্তু (গুণের দিক দিয়ে) তোমদের অবস্থা এমন থাকবে, যেন ঢেউয়ের উপর ফেনা।"

ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে আইনজ্ঞরা বেশ কিছু কারণে পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সেটার পিছনে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণ ছিল; ছিল আর্থ-সামাজিক কারণ; এমনকী মহিলাদের কথাও ভাবা হয়েছিল, যাতে তাঁরা নিজেদের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, গর্ভনিরোধের এই দুই প্রকার পদ্ধতিকেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এ-ও খেয়াল রাখা হয় যে, তা যেন ক্ষতিকর না-হয় এবং তা যেন গর্ভপাতের সহায়ক হিসাবে কাজ না-করে। গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা পুরোপুরি একেকটা পরিবারের ব্যাপার। তাদের এ নিয়ে জোর করা যাবে না, বা তাদের চাপও দেওয়া যাবে না। যে-দেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে, সেই দেশের কাজ হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা প্রসার করা। যাতে সবাই খুব সহজে গর্ভনিরোধক প্রযুক্তিগুলোর সুবিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র পরিবারের হাতে থাকবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলো পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলো তৈরি করেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য। এ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা জানেন, কাকে বলে 'জনবিন্যাস সংক্রান্ত যুদ্ধ'। এর উদ্দেশ্য হল মানুষের সংখ্যা কমানো। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠতার তো একটা ক্ষমতা আছে না! কোনো-কোনো অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার চেষ্টা। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ একটা কথা ভাল করে জানেন যে, (পশ্চিমী) দেশগুলোতে গর্ভনিরোধক সামগ্রী উৎপাদন করা হলেও, কিছু-কিছু সামগ্রীর ব্যবহার খোদ সেই দেশগুলোতেই নিষিদ্ধ। সেগুলোই প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হয় ইসলামি ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এ ক্ষেত্রে সুরক্ষার মানদণ্ডগুলোর সঙ্গে আপস পর্যন্ত করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য পশ্চিমী দেশগুলো কী পরিমাণ বিনিয়োগ করা তা এখনো দেখা বাকি আছে। এ-ও দেখতে হবে যে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তারা আদৌ তৃতীয় বিশ্বে পাঠাতে চায় কি না।

স্তন্যপান। ইসলামে স্তন্যপানকে প্রচণ্ড উৎসাহ দেওয়া হয়। কোনো পরিবার যদি এটাকে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে বলতে হয়, এটা খুব একটা বিশ্বস্ত উপায় নয়। কিন্তু, গোষ্ঠী (যৌথ ভাবে) ভিত্তিক পর্যালোচনার পর এটা অনুমান করা হয়েছে যে, পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত পদ্ধতিকে একত্র করলে যা ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায় স্তন্যপানের মাধ্যমে। একটা বিষয় লক্ষ করা গেছে যে, যেসব

সমাজে স্তন্যপান করানো মহিলার সংখ্যা বেশি, সেসব সমাজে প্রজননের হার কমে গেছে। কোরানেও স্তন্যপানের কথা বলা হয়েছে। এবং এ-ও বলা হয়েছে যে, সাধারণ ভাবে এটা দু'বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ইসলামে স্তন্যপানকে শুধুমাত্র পুষ্টির যোগান দেওয়ার উপায় (বা পরিবার পরিকল্পনার উপায়) হিসাবেই দেখা হয় না। এর স্থান তারও উপরে। এটা একটা 'মূল্যবোধ'। একে বিশেষ বন্ধন গড়ে তোলার উপায় হিসাবেও গণ্য করা হয়। এ দিকটাকে এতটাই মান্য করা হয় যে, কোনো মহিলা যদি অন্যের শিশুকেও স্তন্যপান করান, তাহলে ইসলামে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। একে বলা হয় 'স্তন্যপানের মাতৃত্ব', এবং অপরের সন্তানকে স্তন্যপান করানো মহিলাকে বলা হয় 'স্তন্যদায়িনী মাতা'। এই বিষয়টাকে এতটাই মান দেওয়া হয় যে, বিবাহে আইনে পর্যন্ত 'স্তন্যদায়িনী মাতা'-কে প্রকৃত মাতৃর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সে জন্যই, স্তন্যদায়িনী মাতা যাদের স্তন্যপান করান তাদের এবং স্তন্যদায়িনীর প্রকৃত সন্তানদের ভাই-বোন হিসাবে ধরা হয়। ফলে এই সন্তানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করা যায় না।

ইনট্রাইউটেরাইন ডিভাইস (আইইউডি)। যদি গর্ভপাত করানোর জন্য কোনো ইনট্রাইউটেরাইন ডিভাইসকে গর্ভনিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটাকে মেনে নেওয়া হয় না। আইইউডি আর শুক্রাণু স্থাপনকে বাধা দেওয়ার কাজ করে না। আজকাল যে-ডিভাইস পাওয়া যায়, সেগুলোতে একটা তামার তার থাকে। সেটার থেকে শুক্রাণুনাশক তামার স্থূলাণু বের হয়। কোনো-কোনো ডিভাইসে আবার হরমোন প্রোজেস্টেরোন থাকে। যা সার্ভিক্যাল মিউকাসকে এক ঘন করে দেয় যে, তার মধ্যে শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে না। আইইউডি-র নতুন ডিভাইসগুলো এই দুই ধরনের কাজ করে থাকে। এগুলোকে গর্ভনিরোধকের শ্রেণিতেই রাখা হয়। এগুলো দিয়ে গর্ভপাত করানো হয় না। এ কথা জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

গর্ভপাত। ইসলামি সমাজে 'গর্ভপাত সমর্থক' ও 'গর্ভপাত বিরোধী' বলে কোনো গোষ্ঠী নেই। গর্ভপাত নিয়ে ইসলাম যা ভাবে তা গর্ভনিরোধ সংক্রান্ত ভাবনার চেয়ে একেবারে আলাদা। কেননা, গর্ভপাত মানে হল মানুষের প্রাণকে অস্বীকার করা। এখন স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নটা ওঠে যে, গর্ভে যে ভ্রূণ থাকে, সেটাকে কি মানুষের প্রাণ বলা যেতে পারে? ইসলামি আইনে তাকে মনুষ্য প্রাণ বলেই মনে করা হয়। ইসলাম ভ্রূণকে 'অসম্পূর্ণ ধিম্মা'-র মর্যাদা দেওয়া হয়। ধিম্মা হল এমন এক আইনি মর্যাদা, যার মাধ্যমে মানুষেকে কিছু অধিকার ও কর্তব্য দেওয়া হয়। কিন্তু, ভ্রূণ যেহেতু অসম্পূর্ণ ধিম্মা, তাই তার শুধু অধিকার আছে, কোনো কর্তব্য নেই। ভ্রূণের অধিকারগুলো হল:

1. স্ত্রী গর্ভবতী থাকার অবস্থায় তার স্বামীর মৃত্যু হলে, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে গর্ভে থাকা ভ্রূণ, যদি তার জীবিত সন্তান হিসাবে জন্ম হয়, তবে। আইন নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বাকি উত্তরাধিকারীরাও সম্পত্তির ভাগ পাবে, কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণের জন্যও সম্পত্তির ভাগ রেখে দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, কবে সেই ভ্রূণের জীবিত সন্তান রূপে জন্ম হয়।

2. গর্ভাবস্থার যে-কোনো পর্যায়ে ভ্রূণ যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তার মধ্যে যদি জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা যায়, যেমন কাশি বা নড়াচড়া করা; সে ক্ষেত্রে যে নিয়মটা আছে সেটা হল এই যে, গর্ভে থাকা ভ্রূণ সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে, যেটা সে গর্ভে আসার পর সেই সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। পরে যদি সেই ভ্রূণের মৃত্যু হয়, তাহলে, সেই ভ্রূণ যে-সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, সেই সম্পত্তি বৈধ উত্তরাধিকারীর কাছে চলে যাবে।

3. কোনো মহিলা এমন এক অপরাধ করল, যার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু দেখা গেল সে গর্ভবতী। তখন তার শাস্তির দিন পিছিয়ে দেওয়া হবে। সেই মহিলাকে সন্তান প্রসব করতে দেওয়া হবে। সেই সন্তানকে স্তন্যপান করাতে হবে, যত দিন না-পর্যন্ত সেই সন্তান স্তন্যপান করা বন্ধ করে। গর্ভাবস্থার যে-কোনো পর্যায়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। গর্ভাবস্থা যদি সবে শুরু হয়, সে ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। কেননা, ভ্রূণ যখন প্রাণ লাভ করার একেবারে গোড়ার অবস্থায় থাকে, তখনও তাকে তার বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় না। এই একই নিয়ম অবৈধ গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, বিবাহ বহির্ভূত ভাবে কোনো ভ্রূণ গর্ভস্থ হলে, তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমস্ত সম্প্রদায় ও আইনজ্ঞদের যে-কোনো গোষ্ঠীই সর্বসম্মতিক্রমে এই নিয়ম মেনে চলে।

4. গর্ভপাত করানোর শাস্তি হল আর্থিক জরিমানা। অসাবধানতার জন্যও যদি গর্ভপাত হয়, সে ক্ষেত্রেও এই জরিমানা দিতে হবে। একে বলে ‘ঘোরা’। যদি হিংসাত্মক ভাবে বা ইচ্ছা করে গর্ভপাত করানো হয়, তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবে আদালত।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রাণের সূত্রপাত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইসলামি বৃত্তে আলোচনা করা হচ্ছে। জীবনের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই গর্ভপাতকে অস্বীকার করা হয়েছে (অতীতে কোনো-কোনো আইনজ্ঞ এই নিদান দিয়েছিলেন যে, গর্ভাবস্থার প্রথম চার মাসে গর্ভপাত কারনো যেতে পারে। কেউ-কেউ আবার বলেছিলেন, গর্ভাবস্থার প্রথম সাত সপ্তাহের মধ্যেও তা করানো যেতে পারে। গর্ভাবস্থার সেই সব পর্যায়ে প্রাণের সূত্রপাত হয় না

বলে ধরে নিয়েই ওই সব নিদান দেওয়া হয়েছিল।)। ভ্রূণ যখন দ্রুত অবয়ব ধারণ করতে থাকে, তখন তা অনুভব করতে পারেন মা। এর আগের পর্যায়ে প্রাণের হদিশ পাওয়া যায় না। ঠিক কোন সময়ে পর্যায় চলতে থাকে, তা সঠিক ভাবে বর্ণনা করেছেন প্রায় দশ শতক আগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তাঁর নাম অল গজলি। এই বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক কালের আইন সভাগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছে। তাঁরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার দিকটা নিয়েও বিবেচনা করেছেন। সব শেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঠিক কোন সময়ে একজন ব্যক্তির জীবনে প্রাণের সঞ্চার শুরু হচ্ছে, তা নির্ধারণ করার জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। যেমন: (1) এটা হল স্পষ্ট ও সু-নির্দিষ্ট একটা ঘটনা, (2) এর মধ্যে জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে: বৃদ্ধি, (3) এর বিকাশ যদি ব্যাহত না-হয়, তাহলে তা আমাদের জানা জীবনের পরবর্তী পর্যায়গুলোর মধ্যে বিকশিত হতে থাকবে, (4) এর মধ্যে একটা জেনেটিক প্যাটার্ন থাকতে হবে, যা সামগ্রিক ভাবে মানব জাতির একটা বৈশিষ্ট্য এবং একজন ব্যক্তির অনন্য এক বিশেষত্বও বটে, (5) উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো পর্যায়কেই বাদ দিয়ে এটা এগিয়ে যেতে পারে না।

বারে-বারে গর্ভবতী হওয়ার ফলে যদি কোনো মাতৃর জীবনে সংশয় দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে মেনে নেওয়া যেতে পারে। শরিয়তে মাতৃকে প্রধান শাখা এবং ভ্রূণকে প্রশাখা বলে মনে করা হয়। প্রধান শাখাকে রক্ষা করার দরকার পড়লে প্রশাখাকে কেটে ফেলা যেতে পারে। কেউ-কেউ আবার এই মতও পোষণ করেছেন যে, যদি এমন কোনো জন্মগত অস্বাভাবিকতা ও ভ্রূণের অসুখ দেখা দেয়, যা সম্ভাব্য জীবনের পক্ষে উপযুক্ত নয়, সে ক্ষেত্রেও গর্ভপাতকে মেনে নেওয়া উচিত। সেটা অবশ্যই গর্ভাবস্থার প্রথম চার মাসের মধ্যে করতে হবে।

স্টেরিলাইজেশন। চিকিৎসা বিষয়ক নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই যদি স্টেরিলাইজেশন বা বন্ধ্যাত্বকরণ করানো হয়, তাহলে সেটাকে নিন্দার্হ বলে মনে করা হয়। যদি কোনো মহিলা যথেষ্ট সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর মনে করেন যে, তিনি আর সন্তান জন্ম দিতে চান না, সে ক্ষেত্রে স্টেরিলাইজেশনকে মেনে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে সব কিছু জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেওয়ার অধিকার আছে স্বামী ও স্ত্রীর। তাঁদের এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না যে, পরে তাঁরা নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে চাইলে, অপারেশন করে সফল ভাবেই প্রজনন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যাবে। কোনো সরকারই মানুষকে স্টেরিলাইজেশনের করানোর জন্য চাপ দিতে পারবে না। যদি কোনো ডাক্তারের মনে হয়, স্টেরিলাইজেশনে রোগীর কোনো লাভ হবে না, তাহলে তিনি অপারেশন করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। সেই অধিকার

তাঁর আছে।

প্রজনন অক্ষমতার চিকিৎসা

গর্ভবতী হতে চাওয়াটা ন্যায় সংগত ইচ্ছা। তাই কেউ যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ইচ্ছা পূরণ করতে চায়, তাহলে সেটা সে করতে পারে। তবে দেখতে হবে, শরিয়তকে লঙ্ঘন করার মতো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন। আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনের ক্ষেত্রে স্পার্ম দেওয়ার অধিকার একমাত্র স্বামীর (AIH)। কোনো ডোনারের সিমেন (AID) ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, বৈবাহিক চুক্তির অধীনে এবং সেই চুক্তির দুই পক্ষ (স্বামী ও স্ত্রী)-র মাধ্যমে জন্ম হওয়া সন্তানকেই বৈধ বলে ধরা হয়।

ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ)। এই পদ্ধতি সাধারণ ভাবে 'টেস্ট টিউব বেবি' টেকনোলজি নামেই পরিচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অর্থাৎ বৈবাহিক চুক্তির মধ্যে এই প্রযুক্তিকে যদি ব্যবহার করা হয়, তবেই ইসলামে তাকে মেনে নেওয়া হয়। সেই বৈবাহিক চুক্তি বৈধ ও সক্রিয় থাকতে হবে। বৈধব্য বা তালাকের ফলে বৈবাহিক চুক্তির অবসান হয়। সেই অবস্থায় কোনো মহিলা তাঁর মৃত বা প্রাক্তন স্বামীর সেই স্পার্ম নিয়ে গর্ভবতী হতে পারবেন না, যা স্পার্ম ব্যাঙ্কে জমা থাকে। স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত তৃতীয় কাউকে সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে নিয়ে আসা যাবে না। স্বামী বা স্ত্রীর জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল (স্পার্ম বা ওভাম) ধারণ করার জন্যও অপর কাউকে বলা যাবে না। সেটা করলে স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে গঠিত চুক্তিই ভঙ্গ হয়ে যাবে। 'অপরের স্পার্ম', 'অপরের ওভাম' ও 'অপরের গর্ভ'-কে (স্বামী-স্ত্রীর ভ্রূণ ধারণ করার জন্য) স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

সারোগেট মাতৃত্ব। যখন কোনো মহিলা অপর কোনো স্বামী-স্ত্রীর ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধারণ করে, তখন সেটাকে বলা হয় সারোগেট মাতৃত্ব। ইসলামে এটাকে মেনে নেওয়া হয় না। এই ধরনের গর্ভাবস্থাকে বৈবাহিক চুক্তির বহির্ভূত বলে ধরা হয় বলে, তাকে অবৈধ বলে মনে করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে মাতৃত্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়: জিনগত ও জৈব। কিন্তু, জিন ও জৈব উপাদান একজন মাতৃর মধ্যেই থাকতে হবে। সারোগেসিতে যুক্ত হয়ে যে-মহিলা অন্যের ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি যখন সেই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর, তার উপর মাতৃত্বের অধিকার দাবি করেন, তখন আইনি ও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের সমস্যা আমেরিকাতে আকছার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিশুর পরিণতি নির্ধারণ করার জন্য যে-চুক্তি তৈরি করা হয়, তা সত্যিই অমানবিক। কেননা, শিশুকে তখন একটা পণ্য হিসাবে দেখা হয় মাত্র।

জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে। কেননা, এখনও সারোটে মাতৃত্ব পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। মানব ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনই দেখা যায়নি যে, কোনো মহিলা স্বেচ্ছায় অন্য কারো ভ্রূণকে নিজের গর্ভে ধারণ করছে, এবং সেই ভ্রূণ থেকে হওয়া সন্তানও প্রসব করছে। সেই সন্তান আবার তাকেই ফিরিয়ে দেবে বলে কথা দিয়ে রাখছে, যার থেকে সে ভ্রূণ নিয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ সব করা হচ্ছে, খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে। 'মাতৃত্ব' এখানে 'মূল্যবোধ' থেকে সামগ্রীতে পর্যবসিত হচ্ছে। এটাই যদি প্রচলিত পন্থা হয়ে যায়, তাহলে এক প্রজন্মের সঙ্গে আরেক প্রজন্মের বন্ধন এতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে, তার প্রভাব থেকে যাবে দীর্ঘকাল।

অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন

কোরানে বলা হয়েছে, "যে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচায়, সে আসলে সব মানুষেরই প্রাণ বাঁচায়।" কারও শরীরের কিডনি-লিভার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি আর কাজ না-করে, তাহলে তাকে বাঁচানোর উপায় হল অঙ্গ প্রতিস্থাপন। এর জন্য একজন সুস্থ মানুষের থেকে অঙ্গদান নিতে হয়। শুরুতেই কোরানের যে-বাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনই হয়তো সবচেয়ে ভাল উপায়। ইসলামি নীতি-নিয়মকে সংশ্লেষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।

জীবিত বা মৃত মানুষের শরীর নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করাটা আসলে ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ বের করে নিয়ে অন্য কারো শরীরে প্রতিস্থাপান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামি আইনেই এমন দু'টো কথা বলা আছে, যেগুলো উপরে উল্লেখ করা বাধাকে সরিয়ে দেয়। কী সেই দু'টো কথা। এক. "প্রয়োজন থাকলে নিষেধের বেড়া টপকানো যেতে পারে।" দুই. "দু'টো খারাপ জিনিসের মধ্যে যদি কোনোটাকেই এড়ানো না-যায়, তাহলে দু'টোর মধ্যে যেটা কম খারাপ সেটাকে মেনে নিতে হয়।" কোনো জীবিত বা মৃত শরীরকে অক্ষত রাখার চেয়ে কারো প্রাণ বাঁচানোটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। জীবিত বা মৃতের শরীর কাটা-ছেঁড়া করাটা খারাপ অবশ্যই, কিন্তু তার চেয়ে খারাপ হল কোনো রোগীকে মরতে দেওয়া। সে জন্য অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনকে মেনে নেওয়া হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে, যিনি অঙ্গদান করছেন, তাঁর যেন কোনো ক্ষতি না-হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের সাধ্য অনুযায়ী এদিকটা খেয়াল রাখতেই হবে। কেউ যদি অঙ্গদান করতে রাজি হন, তাহলে দেখতে হবে, দাতা (মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়া হলে, তাঁর নিকট আত্মীয়) যেন স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান করেন, তাঁকে যেন কোনো ভাবে চাপ দেওয়া না-হয়।

নার্ভাস টিস্যু প্রতিস্থাপন। সাম্প্রতিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, নার্ভাস টিস্যু প্রতিস্থাপন করে কোনো-কোনো রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। এই টিস্যু যদি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড মেডুলা বা প্রাণী ভ্রূণ বা নিজে-নিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া মানব ভ্রূণ স্বাভাবিক ভাবে মারা গেল তার থেকে নেওয়াটাই আইন-সংগত। টিস্যু নেওয়ার জন্য যদি জীবন্ত বা প্রাণের সম্ভাবনা থাকা ভ্রূণকে হত্যা করা হয়, তাহলে সেটা কোনো মতেই আইন-সংগত নয়। আইন-সংগত গর্ভপাত (যেখানে মাকে বাঁচানোর দরকার হয়) করা হলে, সেই ভ্রূণের টিস্যু নেওয়া যেতে পারে। টিস্যু নেওয়ার জন্য ভ্রূণ তৈরি করা বা গর্ভপাত করানো বেআইনি।

অ্যানেনসেফালিক ভ্রূণ। জন্মগত অস্বাভাবিকতার ফলে খুলির ভল্ট ও ব্রেন হেমিস্ফিয়ার না-থাকার দরুণ অ্যানেনসেফালিক ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। এমন ভ্রূণ থেকে জীবিত সন্তানের জন্ম হতে পারে, কিন্তু সেই সন্তান কয়েক দিনের মধ্যেই যে-কোনো সময়ে মারা যায়। এমন সন্তান যখন বেঁচে থাকে, তখন তার অঙ্গ নিয়ে অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়। কৃত্রিম ভাবে তার প্রাণ শেষ করাটাও বেআইনি। তার মস্তিষ্ক (স্টেম)-এর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত যাতে তার টিস্যুগুলো সুস্থ থাকে, তার জন্য তাকে কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। তার মৃত্যুর পরেই তার থেকে অঙ্গ নেওয়া যেতে পারে।

যৌন গ্রন্থি প্রতিস্থাপন। একজনের টেস্টিজ (স্পার্ম তৈরি ও নির্গত করতে সক্ষম) আরেক জনের শরীর বা একজন ওভারি (ওভিউলেশনে সক্ষম) আরেক জনের শরীরে প্রতিস্থাপন করাটা বেআইনি। বৈধ বিবাহ ছাড়াই দু'টি জননকোষের মিলনে গর্ভে আসা সন্তানকে নিয়ে এবং তার জিন নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়ে বলেই একে আইনত মেনে নেওয়া হয় না। কেননা, স্পার্ম বা ওভা সমব সময় দাতার নামেই থাকে, গ্রহীতার নামে নয়। যে যৌন গ্রন্থিগুলো স্টেরাইল (অর্থাৎ জননকোষ সৃষ্টি করতে পারে না), কিন্তু হরমোনের দিক দিয়ে সক্রিয়, একমাত্র সেই রকম গ্রন্থিরই প্রতিস্থাপন নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর প্রচলন নেই।

মৃত্যুর সংজ্ঞা

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করাটা খুবই দরকার। কেননা, এর সাহায্যে চিকিৎসা বিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যেমন, কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কার ক্ষেত্রে কখন বন্ধ করতে হবে, বা প্রতিস্থাপনের জন্য কারও শরীর থেকে কখন একটি মাত্র অত্যাবশ্যক অঙ্গ (যেমন হৃৎপিণ্ড) নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, আইনি ক্ষেত্রের সঙ্গেও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের দিকটা সরাসরি যুক্ত। যেমন, দু'জন বা তার বেশি উত্তরাধিকারী

পর-পর মারা গেলে, তাদের সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করার জন্য এর দরকার পড়ে। আবার, কোনো পুরুষ মারা গেলে, তাঁর বিধবা স্ত্রী ঠিক কোন দিন পুনর্বিবাহ করতে পারে সেটা ঠিক করার জন্যও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় জানতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর একজন বিধবা স্ত্রী পুনর্বিবাহ করতে পারে। গর্ভবতী হলে, সন্তান প্রসব করার পর।

সম্প্রতি আইন সভাগুলো মৃত্যুর এক নতুন সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছে। মস্তিষ্কের মৃত্যু বা ব্রেন ডেথকে (ব্রেন স্টেম-এর মৃত্যুকেও এর মধ্যে ধরা হয়েছে) মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এখন। কৃত্রিম ভাবে কোনো-কোনো শারীরিক ক্রিয়াকে সচল রাখা হলেও, ব্রেন ডেথ হয়ে গেলেই তাকে মৃত্যু বলে ধরা হচ্ছে। পুরনো একটি আইনের 'তুলনা' টেনে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। মারাত্মক আঘাতের ক্ষেত্রে ব্রেন ডেথের মতো একটা ধারণাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে পুরনো ওই আইনে। কয়েক শো বছর আগে এই রকম একটা নিয়ম জারি করা হয়েছিল, কেউ যদি কাউকে ছুরি মারে, এবং সেই আঘাতে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির অন্ত্র বেরিয়ে আসে, তাহলে সেটাকে মারাত্মক আঘাত বলে ধরে নেওয়া হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি একটুও নড়াচড়া করে বা তার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অন্যান্য লক্ষণ যদি তার শরীরে প্রকাশ পেতে থাকে, তাহলে সেটাকে 'নিহতের নড়াচড়া' বলে ধরে নেওয়া হবে। সেই আক্রান্তকে যদি দ্বিতীয় আরেক জন এসে (পুরোপুরি) মেরে ফেলে, তাহলে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হবে প্রথম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় আক্রমণকারীকেও কাঠগড়ায় তোলা হবে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলা হবে না। কোনো ব্যক্তির শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় রাখা সত্ত্বেও, তাঁর যদি ব্রেন ডেথ হয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্রিয়া-সক্রিয়তাকে বলা হবে 'নিহতের নড়াচড়া'। এ রকম ধরে নেওয়ার কারণে, সেই ব্যক্তির শারীরিক ক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তার আর বেঁচে ওঠা অসম্ভব। তাই এটাকে কোনো অপরাধ বলে মনে করা হবে না, যদি তাকে কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, বা তার (সজীব ও সতেজ) হৃৎপিণ্ড বের করে নিয়ে এমন কোনো রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়, যার হৃৎপিণ্ড একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, যেটাকে আর সুস্থ করে তোলা যাবে না।

ইউথেনেজিয়া

নেদারল্যান্ডসে ইউথেনেজিয়া আইনসিদ্ধ হয়েছে। আমেরিকার দু'টো স্টেটে এটা নিয়ে ভোটাভুটি হয়েছে, কিন্তু রায় এর বিপক্ষে গেছে। কিন্তু এর লবি খুব সক্রিয় হয়ে উঠছে। ইউথেনেজিয়া নিয়ে ইসলামের মত খুব স্পষ্ট।

মানব জীবন। মোজেস, যিশু ও পয়গম্বরের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মানব জীবনের পবিত্রতাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন আল্লাহ। আবেলকে হত্যা করেছিল তার ভাই কেইন (দু'জনেই আদমের পুত্র)। এ ব্যাপারে কোরানে আল্লাহ বলেছেন, "সে জন্যই, আমরা ইজরায়েলের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি এই আদেশ জারি করেছি যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে— খুন করার জন্যই হোক বা দেশে কোনো উৎপাত সৃষ্টি করার জন্যই হোক— তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে সব মানুষকে হত্যা করেছে। যদি কেউ একজনেরও প্রাণ বাঁচায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছে।" (কোরান 5:32)। কোরানে এ-ও বলা হয়েছে, "কারো প্রাণ হরণ কোরো না। কেননা, আল্লাহ একে পবিত্রতা দান করেছে। আইন মোতাবেক যদি কারো প্রাণ হরণ করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে, একমাত্র তবেই তা করা যেতে পারে।" (কোরান 6:151 ও 17:33)। শরিয়তে সবিস্তারে উল্লেখ করা আছে যে, যুদ্ধে হোক বা শান্তি রক্ষার খাতিরেই হোক, (ফৌজদারি আইনের একটি নিয়ম হিসাবে), কোন-কোন পরিস্থিতিতে প্রাণ হরণ করা যাবে। তা করার আগে কঠোর সব পূর্বশর্ত মানতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মহত্যার অধিকার কারো আছে কি? ইসলামে আত্মহত্যাকে কোনো অধিকার বলে মনে করা হয় না; বরং একে নিয়ম লঙ্ঘন বলেই মনে করা হয়। আমরা কেউই নিজেকে সৃষ্টি করিনি। তাই, আমাদের শরীরের মালিক, আমরা নই। আমরা যাতে তার যত্ন নিই, তাকে পরিপুষ্ট রাখি এবং তাকে রক্ষা করি, সেই দায়িত্বই আমাদের দেওয়া হয়েছে। আমাদের জীবনের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনিই আমাদের এই জীবন দান করেছেন। তাই, এই জীবন দেওয়া ও নেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আমরা সেই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারি না। ইসলামে আত্মহত্যা হল একটা অপরাধ, এবং অনেক বড় পাপ। কোরানে বলা হয়েছে, "আত্মহত্যা (নিজেকে ধ্বংস) কোরো না। কেননা, আল্লাহর কৃপা তুমি অবশ্যই লাভ করবে।" (কোরান 4:29)।

আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ বলেছেন, "কেউ যদি লোহার কোনো জিনিস নিয়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে সেটা তাকে জাহান্নামেও বয়ে বেড়াতে হবে। কেউ যদি বিষপান করে আত্মহত্যা করে, তাহলে জাহান্নামেও অনবরত সেই বিষ পান করে যেতে হবে। কেউ যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে তাকে জাহান্নামের অথল খাদে বারে-বারে পড়তে হবে।"

ইউথেনেজিয়া— "করুণা মৃত্যু"? কোন-কোন পরিস্থিতিতে প্রাণ হরণ করা যেতে পারে, তার একটা নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করে দেওয়া আছে শরিয়তে (অর্থাৎ, পবিত্র মানব জীবন রক্ষার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে)। সেই

তালিকায় করুণা মৃত্যুর কোনো স্থান নেই। একে মেনে নেওয়া হয়নি। মানব জীবনের অন্তর্নিহিত এক মূল্য আছে। তাই, যে-কোনো অবস্থাতেই নিঃশর্ত ভাবে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই হবে। জীবনে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই— এমন ধারণার কোনো অস্তিত্বই নেই ইসলামে।

কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে বা তার থেকে পালাতে নিজের প্রাণ শেষ করে দেওয়াকে মেনে নেওয়া যায় না। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ শিখিয়েছেন, "কোনো এক কালে এমন একজন ছিল, যাকে প্রচুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। একদিন সে আর সহ্য করতে না-পেরে, একটা ছুরি নিয়ে নিজের কব্জির শিরা কেটে আত্মহত্যা করে বসে। আল্লাহ তখন বলেছিলেন, "আমার এই সন্তান সময়ের আগেই নিজের জীবন শেষ করে ফেলেছে। একে আমি বেহেস্তে ঢুকতে দেব না।"" কোনো এক সামরিক অভিযানের সময় একজন মুসলমান নিহত হয়েছিল। তা দেখে পয়গম্বরের সতীর্থরা নিহত সেই মুসলমানের বীরত্ব ও যুদ্ধ করার ক্ষমতার খুব প্রশংসা করছিল। এমন সময় সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে পয়গম্বর বললেন, "ওর ঠাঁই হবে জাহান্নামে।" সতীর্থরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, ওই লোকটা গুরুতর আহত হয়েছিল। সে কখন তলোয়ারের বাঁটটা মাটিতে ঠেকিয়ে ডগাটা নিজের বুকে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। তার মানে সে আত্মহত্যা করেছিল।

ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইসলামিক মেডিসিনের পক্ষ থেকে ইসলামিক কোড অব মেডিক্যাল এথিক্স[20] মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আত্মহত্যার মতো করুণা মৃত্যুকেই সমর্থন করা যায় না। এসব হল নাস্তিক ভাবনা-চিন্তা। নাস্তিকরা মনে করে, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই। কোনো-কোনো রোগ এতই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যে, তখন মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়াই শ্রেয়। এমন দাবিকেও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, মানব জীবনের এমন কোনো বেদনা যাকে কিনা চিকিৎসা বা উপযুক্ত নিউরোসার্জারির সাহায্যে সারিয়ে তোলা যায় না..."

তাছাড়া, বেদনা ও কষ্টের একটা তূরীয় মাত্রা আছে। ধৈর্য ও সহনশীলতাকে ইসলামে উচ্চাসনে বসানো হয় এবং এসবের ভাল প্রতিদানও পাওয়া যায়। কোরানে বলা হয়েছে,

"... যে নিজের ধৈর্যে অবিচল থাকবে, সে অপরিমেয় প্রতিদান লাভ করবে।" (কোরান 39:10)

"... তুমি যে-দুরবস্থা (সমস্যা)-য় পড়ো না কেন, তোমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এর জন্য নিজের মন-প্রাণ এক করে দিতে হবে।" (কোরান 31:17)

পয়গম্বর মহম্মদ আমাদের শিখিয়েছেন, "যখন কোনো ধার্মিক কাঁটার খোঁচা খেয়ে বা তার চেয়েও কোনো গুরুতর আঘাত পেয়ে কষ্ট পেতে থাকে, তখন আল্লাহ তার সব পাপ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে তার সব অপকর্ম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, ঠিক যে ভাবে একটা গাছ তার গা থেকে সমস্ত পাতা খসিয়ে দেয়, সে ভাবে।"

যখন কারো বেদনাকে দূর করার সমস্ত উপায় নিষ্ফল হয় যায়, তখন খুব ভাল কাজ দিতে পারে আধ্যাত্মিকতা। এর সাহায্যেই রোগীর মনে এই বিশ্বাস জাগানো যায় যে, সে যদি অনিবার্য বেদনাকে মেনে নিয়ে সেটাকে সহ্য করে যেতে পারে, তাহলে পরলোকে তার সুফল সে পাবে। সে তখন লাভ করবে এক প্রকৃত ও সহনশীল জীবন। কিন্তু, পরলোকেই যদি কারো বিশ্বাস না-থাকে, তাহলে তার সেই ধারণাকে হয়তো সমর্থন করা যায় না। অবশ্য যদি কেউ ইউথেনেজিয়ার পথে পা বাড়ায়, তাহলে সেটাকে কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না।

আর্থিক দিক। যদি কারো রোগ বা জরাকে নিরাময় করা অসাধ্য হয়ে যায়, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ নিয়ে অবশ্যই কোনো দ্বিমত নেই। এই সমস্যা ক্রমশ বাড়ছেও। তার মধ্যে আবার ইউথেনেজিয়ার পক্ষে থাকা কিছু গোষ্ঠী 'মৃত্যুর অধিকার'-এর ধারণা থেকেও এগিয়ে গিয়ে 'মৃত্যুর কর্তব্য'-এর কথা বলছে। তাদের মত এই যে, মানবযন্ত্র যখন আর উৎপাদন করার মতো অবস্থায় থাকে না, অথচ টিকে থাকে, তখন সে সমাজের উৎপাদনশীল অংশের উপর অপ্রত্যাশিত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই যন্ত্রকে সহসা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া উচিত। তাকে আস্তে-আস্তে স্তব্ধ হতে দিয়ে বসে থাকা যায় না।[21]

এই যুক্তি পুরোপুরি ইসলাম-বিরোধী। আর্থিক বিচার-বিবেচনার তুলনায় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের যত্ন নেওয়া এক ধরনের মূল্যবোধ। এর জন্য মানুষকে স্বেচ্ছায় নিজের সময় দিতে হবে, অর্থ ব্যয় করতে হবে, প্রয়াস পেতে হবে। নিজের বাবা-মায়ের সেবা করেই এই মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখার কাজ শুরু করতে হবে। কোরানে বলা হয়েছে, "তোমার প্রভু এই বিধান দিয়েছেন যে, তুমি একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো। সে জন্যই, তোমাকে নিজের পিতা-মাতার প্রতি সদয় হতে হবে। তোমার জীবৎকালে তোমার পিতা বা মাতা বা পিতা-মাতা দু'জনেই যদি বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছন, তাহলে তাঁদেরকে কোনো সময়েই কোনো অপমানজনক কথা বোলো না। সর্বদা তাঁদের প্রতি সম্মান রেখে কথা বলবে। তাঁদের সামনে সহানুভূতি সহ বিনয়াবনত হয়ে এই কথা বলো, "হে প্রভু, আমার পিতা-মাতার উপর করুণা বর্ষণ করো। কেননা, তাঁরাই আমাকে আমার শৈশবে লালন-

পালন করেছিলেন।"" (17:23-25) আল্লাহর আদেশ মেনে পিতা-মাতার সেবা করতেই হবে। এ এক পুণ্য। পিতা-মাতার সেবা করলে আল্লাহ তার প্রতিদান দেন ইহলোকে ও পরলোকেও। ধার্মিকরা একে ঋণ বলে নয়, বিনিয়োগ বলে মনে করে। বস্তুবাদী ও ধনকেন্দ্রিক সমাজে এই যুক্তির কোনো অর্থ নেই। কিন্তু মূল্যবোধ সম্পন্ন ও ঈশ্বর-সচেতন ধার্মিকদের সমাজে এর মূল্য অনেক।

যখন একার পক্ষে কারো সেবা-যত্ন করার জন্য খরচ কুলানো সম্ভব হয় না, তখন সেই খরচ জোগানের যৌথ দায়িত্ব সমাজের। ইসলামে এ কথাই বলা আছে। সবাইকে তখন খরচ করার ধরনটা পালটাতে হয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের চেয়ে মূল্যবোধ রক্ষার দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় (বিলাসিতা ভোগ করার চেয়ে মূল্যবোধ মেনে চললেই বেশি সুখ পাওয়া যায়)। এর জন্য অতি অবশ্যই সমাজকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার দিকে চালিত হতে হবে। তা নিয়ে আলোচনার জায়গা এটা নয়।

চিকিৎসা বিষয়ক অবস্থা। ইসলামি পরিবেশে ইউথেনেজিয়ার প্রসঙ্গ সাধারণত ওঠে না। যদিও বা ওঠে, তাকে অস্বীকার করা হয়। কেননা, তা ধর্মীয় দিক দিয়ে অনৈতিক। একজন রোগী যেন তার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকী তার আধ্যাত্মিক (ধর্মীয়) উপদেষ্টার থেকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম মানসিক সান্ত্বনা লাভ করে। এ কাজে ডাক্তারও এসে যোগ দেন। রোগীকে বেদনা থেকে উপশম দেওয়ার জন্য তিনি চিকিৎসা করার মাধ্যণে এ কাজ করতে থাকেন। কিন্তু বেদনার উপশমের জন্য পেন কিলার দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় এক দোলাচল দেখা দেয়। এর কারণ হল এই যে, কোনো-কোনো রোগীকে এমন মাত্রায় পেন কিলার দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যা দিলে তা খোদ রোগীর পক্ষেই ঘাতক হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই দোলাচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ডাক্তার তাঁর সুদক্ষ বিবেচনার আশ্রয় নেন। কিন্তু, ধর্মীয় দিক দিয়ে ডাক্তারের উদ্দেশ্যকে বোঝা খুবই দরকার। দেখতে হবে যে, ডাক্তার কি রোগীকে মেরে ফেলতে চাইছেন, না কি সত্যিই রোদীর বেদনার উপশম চাইছেন? আইনি বিচারে ডাক্তারের উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। কিন্তু ইসলাম বলে, আল্লাহর চোখে সবই ধরা পড়বে। তিনি সর্বদাই সবকিছুর উপর নজর রেখে চলেছেন। এ ব্যাপারে কোরানে বলা হয়েছে, "একেবারে গভীর গোপন কথাও তাঁর অবগত। মনের গহনে যা আছে, তা-ও তিনি জানেন।" (40:19) যে-পাপকে আইনের বিচারে প্রমাণ করা যায় না, তা নিয়ে বিচার করা বিচারকের এখতিয়ারের বাইরে। কিন্তু সেই পাপের জবাবদিহি করতে হয় আল্লাহর সামনে।

রোগের চিকিৎসা করাটা ইসলামে বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে পয়গম্বরের দু'টি বাণী আছে। এক. "আল্লাহর কোনো সন্তানের রোগ হলে, তার চিকিৎসা করতে

হবে। কেননা, আল্লাহ সব রোগেরই নিরাময়ের ব্যবস্থা রেখেছেন।" দুই। "তোমার উপর তোমার শরীরের একটা অধিকার আছে।" কিন্তু চিকিৎসায় যদি নিরাময়ের নিশ্চয়তা থাকে না, তখন তা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে না। এই কথা সার্জিক্যাল ও/বা ফার্মাসিউটিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্। গরিষ্ঠ সংখ্যক পণ্ডিতদের মতে, কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখার সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য হওয়া উচিত। একজন জীবিত ব্যক্তির সাধারণ যেসব চাহিদা পূরণ করার অধিকার আছে, এবং যেগুলো 'চিকিৎসা' বলে গণ্য নয়, সেগুলোকে অবশ্য অন্য ভাবে দেখা হয়। এসবের মধ্যে আছে খাদ্য, পানীয়, সাধারণ সেবা-যত্ন। রোগী যত দিন বেঁচে থাকবে, তাকে তত দিন পর্যন্ত এসব দিয়ে যেতে হবে।

ইসলামি কোজ অব মেডিক্যাল এথিক্স (চিকিৎসা নীতি সম্পর্কিত ইসলামি বিধি) (পৃষ্ঠা 67)-তে বলা হয়েছে, "কারো প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে ডাক্তারকে এই সু-পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন নিজের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করে নেন, সেটা যেন তিনি কখনই লঙ্ঘন না-করেন। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, রোগীর প্রাণ বাঁচানো যাবে না, তাহলে বীরত্ব দেখিয়ে রোগীকে অনলস ভাবে ভেজিটেটিভ স্টেটে রেখে দেওয়া, অথবা ডিপ ফ্রিজিং বা অন্যান্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে রোগীকে রেখে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ডাক্তারের লক্ষ্য হওয়া উচিত, জীবনের প্রক্রিয়াকে রক্ষা করা, মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে নয়। কোনো অবস্থাতেই রোগীর প্রাণ নিঃশেষ করার ব্যাপারে ডাক্তার কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না।"

মন্তব্য

কোনো সম্প্রদায়েরই সম্পূর্ণ আদর্শগত প্রেক্ষাপট থেকে ইউথেনেজিয়া নিয়ে আলোচনাকে আলাদা করা যায় না। এ বিষয়ে মুসলমানদের ধারণা নাস্তিকদের ধারণার সঙ্গে একেবারে মিলবে না। কেননা, মুসলমানরা আল্লাহ ও ইলাহি নির্ধারিত শরিয়তে বিশ্বাস করে। মুসলমানদের মত মিলবে না তাদেরও সঙ্গে, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তো স্বীকার করে, কিন্তু তাদের কী করা উচিত বা অনুচিত, তা নিয়ে ঈশ্বরের কোনো কথা বলার অধিকার নেই বলে ভাবে। সমসাময়িক খ্রিস্টীয় সমাজে গির্জা ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার ধারণাগুলো এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে, তার ফলে মানুষের যে-কোনো বিষয় থেকে ঈশ্বরকে দূরে রাখার কথা বলা হচ্ছে। অবশ্য, সমস্ত ধারণাই এক পথে চলছে না।

বিশ শতকে নাৎসি শাসিত জার্মানে ইউথেনেজিয়া নিয়ে যে-অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, তা আমাদের অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছে। বৌদ্ধিক ও পেশাগত দিক দিয়ে সর্বোচ্চ পদে থাকা চিকিৎসকরা এর প্রচার করেছিলেন, এ ব্যাপারে

পথিকৃৎ হয়েছেন, এবং একে বাস্তবায়িত করেছেন। "জীবনে বেঁচে থাকা নিরর্থক"— এই ধারণাকে এক সময় মেনে নিয়ে তার প্রচলন শুরু করা হয়েছিল। এমন সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এমন ধারণার ভিত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যে তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। ইউথেনেজিয়ার লবি ফের নতুন করে নেদারল্যান্ডসে একজোট হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাক করে রয়েছে। কিন্তু এই লবির বিরুদ্ধে যারা রয়েছে, তারা প্রশ্ন তুলছে যে, কী করে কোনো রোগী কোনো ভাবে প্রাভাবিত না-হয়ে সম্মতি দিতে পারে। রোগী তো এমনিতেই তার রোগ-ভোগ নিয়ে হতাশায় ভুগতে থাকে। তার উপর সেই রোগী যদি জানতে পারে, তার রোগ ও সেই রোগের চিকিৎসার জন্য তার পরিবারের লোকেদের কী মানসিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে, এবং তার উপর আর্থিক বোঝাও সামলাতে হচ্ছে, তখন সেই রোগীর তো আর কষ্টের অন্ত থাকবে না। তাছাড়া, পরিবারের থেকেও যে-সম্মতি দেওয়া হয়, তার থেকে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এখন ইউথেনেজিয়ার পক্ষ ও বিপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দেখা যাক, এর ফল কী হয়। কিন্তু, ইসলাম এই সংঘাতকে সহজেই এড়িয়ে যেতে পারবে। কেননা, এর ধর্মতাত্ত্বিক ভিত অনেক মজবুত।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

কোরানে একটা কথা আছে, "খোদার উপর খোদকারি।" সে জন্যই, ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কোরানের মতে, আদম ও ইভকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল শয়তান। কিন্তু সেই শয়তানই এটা দেশে হতাশ হয়েছিল যে, আদম ও ইভ সেই ফল খেয়ে অনুতাপ করছিল। তাই তাদের ঈশ্বর ক্ষমা করে দেন এবং তাদের এই দায়িত্ব দেন যে, তারা ঈশ্বরের সহকারী হিসাবে কাজ করে যেন সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা বিস্তার করে। শয়তান তখন ঈশ্বরকে গিয়ে বলল যে, মানুষের উপর যে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না, তা প্রমাণ করার জন্য তাকে আরও একটা সুযোগ দেওয়া হোক। ঈশ্বর অনুমতি দিলেন যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করার কাজটা করবে। কিন্তু এ-ও স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, শয়তান শুধু তাদেরই বিভ্রান্ত করতে পারবে, যারা শয়তানকে অনুসরণ করতে চাইবে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান যে চক্রান্তের কথা ভেবে রেখেছিল, তা ঈশ্বরকে জানাল। সে বলল, "তোমার সেবকদের মধ্য থেকে আমি যথোপযুক্ত ভাবেই অনেককে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেব। তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করে তাদের মনে নিরর্থক বাসনা জাগিয়ে তুলব। তাদেরকে আমি এমন আদেশ দেব, যা শুনে তারা গরুর কান কেটে ফেলবে (মূর্তিপূজকরা যেভাবে পশুবলি দেয়)। তাদেরকে আমি বলব, খোদার উপর খোদকারি করতে।" কোরানের এই আয়াত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে

ইসলামি পণ্ডিতদের রায় এবং চিকিৎসকদের মতামতকে গভীর ভাবে প্রাভাবিত করেছে। যেমন এই আয়াতে লিঙ্গ পরিবর্তন করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ নারীর রূপ ধারণ করবে এবং নারী করবে পুরুষের রূপ ধারণ। এই আয়াতে স্পষ্টতই এমন অস্বাভাবিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারা সার্জারির উল্লেখ আছে। এটা পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে এই মত পোষণ করা হয়েছে যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে সম্পূর্ণ ভাবে এবং আমূল নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোরানের এই আয়াতের প্রসঙ্গ আনা যাবে না। তা যদি আনা হয়, তাহলে সেটা এত দূর গড়িয়ে যাবে যে, এক সময় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংঘাতের সৃষ্টি হবে। যেমন রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো-কোনো সার্জারির ক্ষেত্রে খোদার উপর খোদকারি করা দরকার হয় বইকি!

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ক্ষেত্রে যেসব বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন হয়েছে, তা নিয়ে বহু নৈতিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে যখন রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির কথা প্রথমবার বর্ণনা করা হয়েছিল, তখন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে, জীবাণু যুদ্ধের জন্য এবার হয়তো অত্যন্ত ক্ষতিকর এক নতুন ব্যাক্টেরিয়া তৈরি করা হবে। এমন কোনো প্রয়োগ সত্যিই ঠিক নয়। জেনেটিক রোগ নির্ণয় করা, তার আশঙ্কা কমানো, তার নিরাময় বা প্রতিরোধের জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রয়োগকে মেনে নেওয়া যায়, এবং তা সত্যিই প্রশংসনীয়ও বটে। জিন প্রতিস্থাপন তো আসলে বলতে গেলে প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত একটা সার্জারি। যদিও সেটা খুবই ক্ষুদ্র স্তরে হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে ফার্মাসিউটিক্যালের দিক দিয়ে যে সম্ভাবনা আছে, তা হয়তো বহু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশাল পথ খুলে দিতে পারে। কৃষি ও পশুপালনেও এর সম্ভাবনা ব্যাপক। সেটা করতে পারলে, বিশ্ব জুড়ে দুর্ভিক্ষের সমস্যা হয়তো দূর করা যাবে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আসল উদ্বেগ অজানা ও অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যৎকে নিয়ে। নতুন জিন গ্রাফ্ট করার সম্ভাবনা শুধু সোম্যাটিক সেলে নেই, জার্ম সেলেও রয়েছে। যার প্রভাব পড়বে আসন্ন প্রজন্মগুলোর উপর। পরে হয়তো দেখা গেল জীবাণু ও ব্যাক্টেরিয়াগুলো মিউটেশনের মাধ্যমে নিজের বংশ বিস্তার চালিয়ে যেতে লাগল। এ বড় করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন। কিছু সময় ধরে পারমাণবিক বিকিরণের বিপদ দেখতে পাওয়া যায়নি। অবশ্য, তার ফলে যা ক্ষতি হয়েছে, তা ঠিক করাও হয়নি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ক্ষেত্রে থাকা ঝুঁকি কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর।

এক প্রজাতির প্রাণীর থেকে জেনেটিক উপাদান নিয়ে আরেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে স্থাপন করতে পারা মানে, নতুন প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করা, যার মধ্যে দুই প্রজাতিরই বৈশিষ্ট্য থাকবে। মানুষ অজানাকে জানতে চায়; এবং যা অর্জন করা

হয়নি, তাকে অর্জন করতে চায়। সেই লক্ষ্য নিয়ে মানুষ যদি বেপরোয়া ভাবে এক প্রজাতির প্রাণীর থেকে আরেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে জিন প্রতিস্থাপন করার কাজ করতে থাকে, তাহলে মানুষ এমন এক জীবন ধারণের মুখোমুখি হবে, যা এখনো পর্যন্ত জৈবিক পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়নি। এ রকম যদি হয়, তাহলে বিজ্ঞানীরা হয়তো ভাববেন যে, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষের উপর যদি এটা প্রয়োগ করে অদল-বদল ঘটানো যায়, তাহলে বিষয়টা আর রোগের মোকাবিলা করার মধ্যে আটকে থাকবে না। মানুষ তখন নিজের পছন্দ মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে চাইবে। তখন নতুন এক অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠবে। যেসব (সাধারণ) মানুষ নিজের পছন্দ মতো অসাধারণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে পারবে না, তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে। তার চেয়ে বাজে ব্যাপার হবে এই যে, যেসব জিনের জন্য মানুষের আচরণ গড়ে উঠে, সেগুলোকে আলাদা করে নিয়ে এসে, সেটাকে নতুন রূপে গড়ে তুলে আচরণে অদল-বদল ঘটানো হবে। সব মানুষেরই নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব থাকে। নিজের-নিজের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা পালনের সামর্থ্য থাকে। সেই ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যকেও যদি এই ভাবে অদল-বদল করা হয়, তাহলে ইসলামে সেটাকে অতি অবশ্যই ধিক্কার দেবে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে। এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে-বিনিয়োগকারীরা এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আশা করবেন যে, এর থেকে সর্বোচ্চ আর্থিক লাভ হোক। বহু বিজ্ঞানীই তাঁদের গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসেছেন সোনা কুড়োনোর জন্য। এক সময় যাঁরা খোলাখুলি জনহিতের স্বার্থে কাজ করছিলেন, এখন তাঁরা বাণিজ্য সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করছেন এবং যেসব জীব উদ্ভাবন করা হচ্ছে সেগুলোকে পেটেন্টের আওতায় নিয়ে আসছেন। সাম্য, ন্যায় ও সর্বজন কল্যাণের কথা মাথায় রেখে নৈতিকতার সপক্ষে সওয়ালও করা হচ্ছে। এখন হয়তো এ সব নিয়ে সামগ্রিক ভাবে জন সমক্ষে তর্ক-আলোচনা করা উচিত। সেই সঙ্গে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি নৈতিক বিধি তৈরি করারও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এখন। এখনও অনেক কিছু হওয়ার বাকি আছে। গল্প তো শুরু হয়েছে মাত্র।

পাদটীকা

14. 1992 সালের এপ্রিল মাস

15. ওয়ার্ল্ড হেল্থ ফোরাম, খণ্ড 14, 1993, 105।

16. মাইকেল হ্যান্ডারসন, হোপ ফর এ চেঞ্জ (সালেম: গ্রসভেনর বুক্স, 1991), 24-এ উল্লিখিত।

17. ন্যাশনাল আর্কাইভস। ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডি মেমোরেন্ডাম 200। RG 273।

18. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটা সাধারণ ঘটনা। এই দেশগুলোর মানুষ তরুণ বয়স্ক। এমনটা হওয়ার কারণ, এই দেশগুলোতে জন্মের হার খুব বেশি, এতে বিশেষ করে তরুণদেরই অবদান বেশি, সেই সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এই দেশগুলোয় মানুষের গড় আয়ু কম। সম্পাদিত।

19. কিথ এল. উডওয়ার্ড প্রমুখ, "গেজ ইন দি ক্লার্জি", নিউজউইক, 23 ফেব্রুয়ারি, 1987, 58।

20. ইসলামি কোড অব মেডিক্যাল এথিক্স (কুয়েত: ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, 1981), 65।

21. অ্যাটালি জাক। লা মেডিসিন এন অ্যাকিউজেশন। মাইকেল সোলোমন, 'এল'' অ্যাভেনির দে লা ভাই', সংকলন। লেস ভিসেজেস দে এল'অ্যাভেনির-এ উদ্ধৃত। (প্যারিস: সেঘার্স, 1981), 273-275।